আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪

MARTYRS' DAY &
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2014

আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানা বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালের বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ : শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অকটোবর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় তিনজন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নিপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

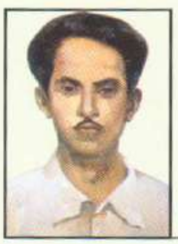

শফিউর রহমান : ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলায় কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকা চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বলে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা সম্ভব হয়।

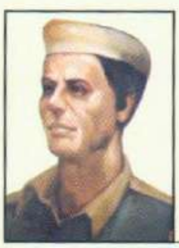

আবদুল জব্বার : শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায়। প্রায় বারো বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। শহীদ আবদুল জব্বারের পাকিস্তানের প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাহিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে যারা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

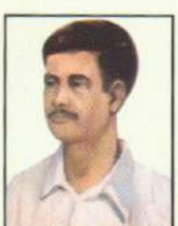

আবদুস সালাম : শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর চাকরির সন্ধানে ঢাকা এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিস বিভাগে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলতে ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর লাশ আজিমপুর করবস্থানে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল আউয়াল : শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ২৬ বছর । পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলা ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড। শহীদ আউয়াল সম্পর্কে এর বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অহিউল্লাহ : শহীদ অহিউল্লাহ ৮/৯ বছরের বালক। অহিউল্লাহর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশা রাজমিস্ত্রি। ১৩৬২ সনের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তাঁর মাথায়। পুলিশ অতি দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয়, গায়েব করে দেয়।

তাঁদেরই আত্মত্যাগে

ভাষা-আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা অজানাই রয়ে যাবে। শুধু ছাত্র নন, ওই মহান আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সাধারণ মানুষও। মরদেহ ও পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্র সাতজনের, অবশিষ্ট শহীদেরা বিস্মৃতির পাতায়, কারণ মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলে, গায়েব করে দেয়।

এখানে সাত অমর শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত হলো।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ ফাল্গুন ১৪২০
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিটি বাঙালির শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দিন, সালামসহ আরও অনেকে।

আজকের এই দিনে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

এই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দেন ভাষা শহীদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আজ বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের ২৫ কোটির বেশি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। গত পাঁচ বছরে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ইতিহাসে ২০০৯ থেকে ২০১৩ ছিল একটি স্বর্ণযুগ।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ নেই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

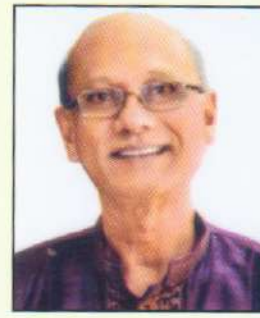

বাণী

ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের বাহন নয়। আমাদের সকল অস্তিত্ব ও অনুভূতির সঙ্গে ভাষা মিশে আছে। আমাদের আবেগ, অনুভূতি, অনুরাগ ও বিদ্বেষ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। জাতির মনন, মেধা, তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য ভাষার মাধ্যমে যুগপরম্পরায় বাহিত ও অনুশীলিত হয়ে আসছে। সে-অর্থে ভাষা ও জাতির পরিচয় অভিন্ন। ১৯৫২ সনে আমাদের ভাষিক সত্তা অস্বীকার করার সঙ্গে আবহমান কাল ধরে চর্চিত আমাদের সংস্কৃতি ও স্বকীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। কোনো জাতিই তা সহ্য করতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষও তা পারেনি। একুশে ফেব্রুয়ারি বুকের রক্ত দিয়েই আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি মাতৃভাষার অধিকার। আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা-আন্দোলন আমাদের আত্ম-আবিষ্কারের স্মারক; সংঘবদ্ধ শক্তিতে জাগরিত হয়ে সকল অন্যায়, অবিচার ও আগ্রাসন প্রতিহত করে নিজেদের বৃহত্তর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার শিক্ষা। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে, পরবর্তীকালের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের পরাজিত করে অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা, আমাদের নিজস্ব স্বদেশভূমি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস ঘটনাবহুল, জাতির জনক, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ হারানোর বেদনায় বিধুর; একাত্তরের পরাজিত শক্তির নখরাঘাতে সাময়িকভাবে বিক্ষত হয়েও একুশে ফেব্রুয়ারির অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উচ্চকিত। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। ১৯৯৯ সনে তাঁরই ত্বরিত উদ্যোগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর মর্যাদা লাভ করেছে। এ সাফল্য সমগ্র জাতির, সকল মাতৃভাষাভাষীর। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত রয়েছে। ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছে। এ প্রচেষ্টায় আমাদের যেসব ভাষার এখনো লিখন ব্যবস্থা নেই সেগুলি অধিকতর জীবন্ত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সহায়ক ভাষা হয়ে উঠবে। সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল শিশুকে অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা দানের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার বাস্তবায়ন এর ফলে সহজ হবে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪ পালনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি স্মরণিকা প্রকাশসহ চার দিনের অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। আমি এ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি। আশা করি, ইনস্টিটিউট ক্রমান্বয়ে প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর কার্যক্রম বিশ্ববাসীকে উৎসাহিত এবং সকল মাতৃভাষাভাষীকে তাদের ভাষার আধুনিকায়নে প্রেরণা যোগাবে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তারা মা'র বুক খালি করে অন্য কোনো মা'র বুকে চলে যায়
তারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে, তারা জমি চাষ করে ফের রক্তাপ্লুত করে জমি
কখনো ফসল হয়ে যায় তারা, শস্য হয়ে যায় তারা
ফুল হয়ে যায়, ফলবান বৃক্ষ হয়ে ওঠে আকালের দেশে
অমৃতের পুত্ররা মরে না, তারা শুধু প্রাণ দিতে ভালোবাসে...

একুশের আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি তার আত্মঅন্বেষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় মানুষের জন্য জীবন দান করতে শুরু করে। বাঙালির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব তাই গভীর ও ব্যাপক। ভাষা শহীদদের আত্মাহুতি আমাদেরকে সকল আন্দোলন ও সংগ্রামে সাহসী ও বিজয়ী করেছে। নিজেদের মর্যাদা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় অমর একুশের পথ ধরেই আমরা পৌঁছেছি একাত্তরে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে অর্জন করেছি নিজেদের জাতিসত্তা, নিজস্ব আবাসভূমি, একটি জাতীয় পতাকা ও একটি জাতীয় সংগীত। সে-অর্থে ভাষা শহীদেরা অমৃতের সন্তান, জাতিস্মর। যেখানেই অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতন, সেখানেই তাঁদের আবির্ভাব। বঞ্চিত মানুষের তাঁরা আশ্রয়, শক্তি ও প্রেরণা।

একুশের শিক্ষা ও চেতনা আজ বিশ্বময় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এখন তা অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরব। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ষড়যন্ত্র ও সমরাস্ত্র নিঃশেষিত করেছে বহু ভাষা ও ভাষিক সম্প্রদায়কে। সেই বিপন্ন দশা থেকে এখনো মুক্তি মেলেনি। এখনো প্রতি চৌদ্দ দিনে একটি ভাষার মৃত্যু হচ্ছে। ভাষা হারিয়ে যাওয়ার অর্থ ভাষাভাষীদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানবোধ, তাঁদের সংস্কার ও জীবনদর্শন হারিয়ে যাওয়া। ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানব সভ্যতা। একুশের দৃষ্টান্ত উদ্দীপিত করে চলেছে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীকে, বিপন্ন-প্রায় ভাষিক সম্প্রদায়কে। তাঁরা নিজেরাই এখন তাঁদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও তা পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট। বাঙালি ও বাংলা ভাষার স্থান এখন তাঁদের মর্মমূলে, চেতনার গভীরে।

সব ভাষাভাষীদের মাতৃভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। আশা করি, ইনস্টিটিউট তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হবে বিশ্ববাসীর মাতৃভাষা-গবেষণার এক অনন্য পীঠস্থানে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনস্টিটিউট কর্তৃক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপোষণ ও নির্দেশনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অগ্রযাত্রা ক্রমান্বয়ে আরো গতিশীল ও বহুমুখী হয়ে উঠবে – তা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ড. মোহাম্মদ সাদিক

Director-General
UNESCO

বাণী

For 14 years now, UNESCO and its partners have celebrated International Mother Language Day. We have organized activities, conferences, concerts and seminars around the world to highlight the importance of linguistic diversity and multilingualism.

The protection and promotion of mother languages are keys to global citizenship and authentic mutual understanding. Understanding and speaking more than one language leads to a greater understanding of the wealth of cultural interactions in our world. Recognizing local languages enables more people to make their voices heard and take an active part in their collective fate. That is why UNESCO makes every effort to promote the harmonious coexistence of the 7,000 languages spoken by humanity.

This year, we place special emphasis on "Local languages for global citizenship: spotlight on science", showing how languages ensure access to knowledge, its transmission and its plurality. Contrary to popular wisdom, local languages are perfectly capable of transmitting the most modern scientific knowledge in mathematics, physics, technology and so on. Recognizing these languages also means opening the door to a great deal of often overlooked traditional scientific knowledge to enrich our overall knowledge base.

Local languages constitute the majority of languages spoken across our world in the field of science. They are also the most endangered. Excluding languages means excluding those who speak them from their fundamental human right to scientific knowledge.

And yet, the rapprochement of peoples in the "global village" makes working towards intercultural understanding and dialogue ever more vital. In today's world, the norm is to use at least three languages, including one local language, one language of wider communication and one international language to communicate at both the local and global levels. This linguistic and cultural diversity may be our best chance for the future: for creativity, innovation and inclusion. We must not squander it.

International Mother Language Day has contributed for more than a decade to highlighting the many roles played by languages in shaping minds, in the broadest sense, and building a global citizenship where we all have the means of contributing to the lives and challenges of societies. I call upon all the Member States of UNESCO, the International Organisation of La Francophonie - which is associated with the Day in 2014 - those active in civil society, educators, cultural associations and the media to make the most of this promise of linguistic diversity for peace and sustainable development.

Irina Bokova

ভাষা-আন্দোলনের দিনগুলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিছুদিন পরে তিনি [খাজা নাজিমুদ্দীন] পূর্ব বাংলায় আসেন। প্রথমবারে তিনি কিছুই বলেন নাই। কিছুদিন পরে, বোধহয় ১৯৫১ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন, ''উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে ওয়াদা করছিলেন, সে ওয়াদার খেলাপ করলেন। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং নিজেই পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার অফিসিয়াল ভাষা 'বাংলা' হবে। তাছাড়া যাতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে। এ প্রস্তাব পূর্ব বাংলার আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। যে ঢাকায় বসে তিনি ওয়াদা করেছিলেন সেই ঢাকায় বসেই উল্টা বললেন। দেশের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হল। তখন একমাত্র রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ এবং যুবাদের প্রতিষ্ঠান যুবলীগ সকলেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে।

আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে । আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম । আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিত। রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পিছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। আমি অনেক রাতে একা হাঁটাচলা করতাম। রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগও রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। অলি আহাদ যদিও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হয় নাই, তবুও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। আরও বললাম, ''খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস।" আরও দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে।

মানুষকে ব্যবহার, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।

মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না

আমি আরও বললাম, ''আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে।" আমি একথাও বলেছিলাম, ''মহিউদ্দিন জেলে আছে, আমার কাছে থাকে। যদি সে অনশন করতে রাজি হয়, তবে খবর দেব। তার নামটাও আমার নামের সাথে দিয়ে দিবে। আমাদের অনশনের নোটিশ দেওয়ার পরই শওকত মিয়া প্যামপ্লেট ও পোস্টার ছাপিয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করবে।"

এদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনও ধার্য করা হয়েছে। কারণ, ঐদিনই পূর্ব বাংলার আইনসভা বসবে। কাজী গোলাম মাহাবুবকে সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ছাত্ররাই এককভাবে বাংলা ভাষার দাবির জন্য সংগ্রাম করেছিল। এবার আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ এগিয়ে আসবে। কারণ জনগণ বুঝতে শুরু করেছে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করতে পারলে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল আবার পরতে হবে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ছাপ্পান্নজন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও শুধুমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বাঙালিরা করতে চায় নাই। তারা চেয়েছে বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙালির এই উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।...

১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌছালাম দেখি, একটু পরেই মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড়ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কি? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদেরকে ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করতে দেখেছে। আমাকে দেখেই বলে বসল, "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।" আমি বললাম, "কিসমত"। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভিতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভিতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পিছনে পিছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোন চেনা লোকের সাথে দেখা হল না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়নগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। একজন চেনা লোককে থানায় দেখলাম, তাকে বললাম, শামসুজ্জোহাকে খবর দিতে। খান সাহেব ওসমান আলী সাহেবের বাড়ি সকলেই চিনে। এক ঘণ্টার মধ্যে জোহা সাহেব, বজলুর রহমান ও আরও অনেকে থানায় এসে হাজির। আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। পরে আলমাস আলীও আমাদের দেখতে এসেছিল। আমি ওদের বললাম, ''রাতে হোটেলে খেতে যাব। কোন হোটেলে যাব বলে যান। আপনারা পূর্বেই সেই হোটেলে বসে থাকবেন। আলাপ আছে।" আমাদের কেন বদলি করেছে, ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে, এর মধ্যেই বলে দিলাম। বেশি সময় তাদের থাকতে দিল না থানায়। হোটেলের নাম বলে বিদায় নিল। আমি বললাম, ''রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটায় আমরা পৌঁছাব।" নতুন একটা হোটেল হয়েছে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডের উপরে, হোটেলটা দোতালা।

আমি সুবেদার সাহেবকে বললাম যে, ''আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার, চলুন, হোটেলে খাই। সেখান থেকে জাহাজঘাটে

চলে যাব।" সে রাজি হল। আমার কথা ফেলবে না এ বিশ্বাস আমার ছিল। আর আমাদের তো খাওয়াতে হবে। একজন সিপাহি দিয়ে মালপত্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিল আর আমরা যথাসময়ে হোটেলে পৌঁছালাম। দোতালায় একটা ঘরে বসার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছে আমরা বসে পড়লাম। আট-দশজন কর্মী নিয়ে জোহা সাহেব বসে আছেন। আমরা আস্তে আস্তে খাওয়া-দাওয়া করলাম, আলাপ-আলোচনা করলাম। ভাসানী সাহেব, হক সাহেব ও অন্যান্য নেতাদের খবর দিতে বললাম। খবরের কাগজে যদি দিতে পারে চেষ্টা করবে। বললাম, সাপ্তাহিক ইত্তেফাক তো আছেই। আমরা যে আগামীকাল থেকে আমরণ অনশন শুরু করব, সেকথাও তাদের বললাম, যদিও তারা পূর্বেই খবর পেয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের কর্মীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা কোনো রাজনৈতিক কর্মী ভুলতে পারে না। তারা আমাকে বলল, ''২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি তো আছেই, আপনাদের মুক্তির দাবিও আমরা করব।" এখানেও আমাকে নেতারা প্রশ্ন করল, ''মহিউদ্দিনকে বিশ্বাস করা যায় কি না! আবার বাইরে এসে মুসলিম লীগ করবে না তো!'' আমি বললাম, ''আমাদের কাজ আমরা করি, তার কর্তব্য সে করবে। তবে মুসলিম লীগ করবে না। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সে বন্দি, তার মুক্তি চাইতে আপত্তি কি! মানুষকে ব্যবহার, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।" ...

২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দীনের নামে কোন স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু ''রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', বললেই তো হত। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দু'জনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি, ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম। দুইজন কয়েদি ছিল আমাদের পাহারা দেবার এবং কাজকর্ম করে দেবার জন্য। তাড়াতাড়ি আমাদের ধরে শুইয়ে দিল। খুব খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। গুলি করার তো কোন দরকার ছিল না। হরতাল করবে, সভা ও শোভাযাত্রা করবে, কেউ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। কোনো গোলমাল সৃষ্টি করার কথা তো কেউ চিন্তা করে নাই। ১৪৪ ধারা দিলেই গোলমাল হয়, না দিলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অনেক রাতে একজন সিপাহি এসে বলল, ছাত্র মারা গেছে অনেক। বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। রাতে আর কোন খবর নাই। ঘুম তো এমনিই হয় না, তারপর আবার এই খবর। পরের দিন নয়-দশটার সময় বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়েছে, বড় রাস্তার কাছেই জেল। শোভাযাত্রীদের স্লোগান পরিষ্কার শুনতে পেতাম, হাসপাতালের দোতলা থেকে দেখাও যায়, কিন্তু আমরা নিচের তলায়। হর্ন দিয়ে একজন বক্তৃতা করছে। আমাদের জানাবার জন্যই হবে। কি হয়েছে ঢাকায় আমরা কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো খবর দিতে চায় না। আমরা যেন কোন খবর না পাই, আর কোনো খবর না দিতে পারি বাইরে, এই তাদের চেষ্টা। খবরের কাগজ তো একদিন পরে আসবে, ঢাকা থেকে।

২২ তারিখে সারাদিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম।...

এদিকে মুসলিম লীগের কাগজগুলি শহীদ সাহেবের বিবৃতি এমনভাবে বিকৃত করে ছাপিয়েছে যে মনে হয় তিনিও উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হোক এটাই চান। আমি সাধারণ সম্পাদক হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করলাম। তাতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে এবং যাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তির দাবি করলাম। সরকার যে বলেছেন, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের উসকানিতে এই আন্দোলন হয়েছে, তার প্রমাণ চাইলাম। 'হিন্দু ছাত্ররা' কলকাতা থেকে এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করেছে, একথা বলতেও কৃপণতা করে নাই মুসলিম লীগ নেতারা। তাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছাত্রসহ পাঁচ ছয়জন লোক মারা গেল গুলি খেয়ে, তারা সকলেই মুসলমান কি না? যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন

মুসলমান কি না? এত ছাত্র কলকাতা থেকে এল একজনকেও ধরতে পারল না যে সরকার, সে সরকারের গদিতে থাকার অধিকার নাই। পার্টির কাজে আতাউর রহমান খান সাহেবের কাছ থেকে সকল রকম সাহায্য ও সহানুভূতি আমি পেয়েছিলাম। ইয়ার মোহাম্মদ খানও আমাকে সাহায্য করেছিলেন কাজ করতে। আমরা এক আলোচনা সভা করলাম, তাতে ঠিক হল আমাকে করাচি যেতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি করতে হবে। ...

আমি যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেবের সাথে দেখা করতে তাঁর অফিসে হাজির হলাম। প্রধানমন্ত্রীর এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি মিস্টার সাজেদ আলী আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে আমি পূর্ব থেকে জানতাম, তিনি কলকাতার বাসিন্দা। পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর পিএ ছিলেন। আমাকে নিয়ে বসালেন তাঁর কামরায়। আমার জন্য বিশ মিনিট সময় ধার্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমাকে খাজা সাহেব তাঁর কামরায় নিজে এগিয়ে এসে নিয়ে বসালেন। যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন, আমার শরীর কেমন? আমি কেমন আছি, কতদিন থাকব – এই সব জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যে একজন ভাল কর্মী সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন এবং আমাকে স্নেহও করতেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, ''মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলীসহ সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে। আরও বললাম, জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে, কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল?" তিনি বললেন, "এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, আমি কি করতে পারি?" আমি বললাম, '' আপনি মুসলিম সরকারের প্রধানমন্ত্রী, আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার, আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আপনি তো চান না যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, আর আমরাও তা চাই না। আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, এজন্য যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছুই হবে না।"

শান্তি সম্মেলন শুরু হল। তিনশত আটাত্তর জন সদস্য সাঁইত্রিশটা দেশ থেকে যোগদান করেছে। সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা উড়ছে। শান্তির কপোত এঁকে সমস্ত হলটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক টেবিলে হেডফোন আছে। আমরা পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একপাশে বসেছি। বিভিন্ন দেশের নেতারা বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। প্রত্যেক দেশের একজন বা দুইজন সভাপতিত্ব করতেন। বক্তৃতা চলছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও অনেকেই বক্তৃতা করলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ইংরেজি থেকে চীনা, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় প্রতিনিধিরা শুনবেন। কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ায় অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য। আমার বক্তৃতার পরে মনোজ বসু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে কেউ পারে নাই। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি"

[অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে সংকলিত]

বিশ শতকে
বাংলাভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

রফিকুল ইসলাম

বিশ শতকের আগে যে উনিশটি শতক কেটে গেছে তার প্রথম নয় শতকে বাংলাভাষার কোন অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে তখন যেসব আর্যপূর্ব ভাষা প্রচলিত ছিল সেগুলি প্রধানত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বতি-বর্মি ভাষা। ঐ সব ভাষা গোষ্ঠীর কিছু কিছু শাখা একুশ শতকেও বাংলাভাষী অঞ্চলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষারূপে প্রচলিত; যেমন – সাঁওতাল, ওঁরাও, বোড়ো, গারো/আচিক প্রভৃতি। বস্তুত, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল সপ্তম শতকের আগে আর্যিকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সপ্তম শতকের মধ্যে বিহারে আর্যদের আগমন ঘটে। বাংলায় আর্যদের আগমন ঘটেছিল সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে। এ আর্যরা ছিল সম্ভবত জৈন ও বৌদ্ধ। স্মরণীয়, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে দশম শতকের মধ্যে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তেরো শতক পর্যন্ত ওড়িয়া, বাংলা ও অসমি ভাষার রূপ অনেক কাছাকাছি ছিল। তেরো শতকের দিকে ওড়িয়া এবং ষোলো শতকের দিকে অসমি ভাষা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। এখনো এই তিনটি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

দশম শতকের আগে বাংলাভাষার কোনো লিখিতরূপ পাওয়া যায়নি। আনুমানিক দশম শতকে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ রচিত *চর্যাগীতিকা বা বৌদ্ধগান* ও *দোঁহা*-কে বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যেও প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয়; কিন্তু এরপর পনেরো শতকের আগে পর্যন্ত বাংলাভাষায় বাংলা বর্ণমালায় রচিত বড়ু-চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য* ছাড়া বিশেষ কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পনেরো শতক থেকে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কবিদের রচিত বহুকাব্য পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, বাংলায় মুসলমান শাসনামলে বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলের আগে বাংলাভাষায় গদ্যসাহিত্য পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের মধ্যে বাংলাভাষায় সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত সাহিত্য কর্মেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এর প্রধান কারণ ইংরেজ আমলে বাংলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয় – যাকে উনিশ শতকের নবজাগরণ বলে অভিহিত করা হয়। এ নবজাগরণের সূচনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাধনায় এবং চরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অপরিমেয় আত্মদান এবং তুলনাবিহীন বিক্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাঙালি তার মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছিল উনিশ শতকে আর শেষার্ধ বিশ শতকে। উনিশ শতকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *কল্পনা* প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল – এই দশ বছর পৈত্রিক জমিদারি তদারকি-সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনার শাহজাদপুর এবং নওগাঁর পতিসরে বসবাস করেন। এই সময়ে তিনি নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ বিশেষত কুষ্টিয়ার বাউল ফকির লালনশাহের শিষ্যদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। এই মরমি বাউল সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম চেতনা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যার পরিচয় তাঁর স্বদেশি ও বাউলগানে এবং

গীতাঞ্জলি-তে সংকলিত ১৫৭টি গান বা কবিতা পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা, স্ত্রী, একপুত্র ও এক কন্যাকে হারিয়ে ছিলেন। বাউল প্রভাব এবং নিকট আত্মীয় হারানোর বেদনা রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে কীভাবে পরিবর্তিত করেছিল তা *গীতাঞ্জলি*-র বিভিন্ন কবিতা ও গানে প্রতিফলিত হয়েছে।

গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি তা স্থগিত করে শিলাইদহ যান এবং সেখান থেকেই *গীতাঞ্জলি*-র গান ও কবিতাগুলির ইংরেজি গদ্যানুবাদের কাজ শুরু করেন। পরে যখন তিনি জাহাজযোগে বিলেতে পাড়ি জমান তখন সাগরপথে তাঁর অনুবাদকর্ম চলতে থাকে এবং তা শেষ হয় বিলেতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথের অনুদিত ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-তে বাংলা *গীতাঞ্জলি* থেকে তিপ্পান্নটি এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পঞ্চাশটি গান ও কবিতা সংযোজন করা হয়। ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ১৯১২ সালের ১লা নভেম্বর ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* প্রকাশিত হয় যার ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত কবি ডব্লিউ বি ইয়েট্স। ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-তে বাংলা *গীতাঞ্জলি*-র ৫৩টি, *গীতিমাল্য*-এর ১৬টি, *নৈবেদ্য* থেকে ১৫টি, *খেয়া* থেকে ১১টি, *শিশু* থেকে ৩টি এবং *কল্পনা*, *চৈতালী*, *উৎসর্গ*, *স্মরণ* ও *অচলায়তন* থেকে ১টি করে কবিতা বা গানের ইংরেজি গদ্যানুবাদ সংকলন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সুইডিশ অ্যাকাডেমী কর্তৃক ১৯১৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সে বছরই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে মনোনীত করা হয়। বস্তুত, এখন থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯১৩ সালের শেষদিকে যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*-র ১০৩টি কবিতা ও গানের গীতিকাব্যিক ইংরেজি গদ্যানুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর পূর্বে ভারতের বাইরে ইংল্যান্ডের কয়েকজন শিল্পীসাহিত্যিক ছাড়া বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিশেষ ধারণা ছিল না। ঐ বছর ব্রিটিশ রয়াল সোসাইটি ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি-র নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করছিল; কিন্তু তিনি সে-পুরস্কার পাননি, পেয়েছিলেন ইংরেজ ঔপনিবেশ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এভাবেই বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রথমবারের মতো বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে গুরুত্ব পেয়েছিল।

বিশ শতকে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান ছিল একটি বহুজাতিক, বহুসাংস্কৃতিক, বহুভাষিক এবং বহুধার্মিক হাজার মাইলের ব্যবধানে বিভক্ত দুটি অংশের একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির সংখ্যা ছিল শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ, বাকি ছেচল্লিশ ভাগ ছিল পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পাঠান, বালুচ, কাশ্মীরি এবং মহাজের যাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষা স্বতন্ত্র। সেই পাকিস্তানে বাংলাভাষা যখন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা তো দূরের কথা, পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার সঙ্গে সমান মর্যাদা পেতেও সক্ষম হলো না তখন ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাভাষা আন্দোলন চলেছিল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে বাংলাভাষার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন বাঙালির শহীদ হওয়ার ঘটনা বাংলভাষা আন্দোলনকে চরমপর্যায়ে পৌছে দিয়েছিল। ভাষা শহীদের রক্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প। একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালির একুশ দফা দাবি। সে-দাবির ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী এবং মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দমনের জন্য পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরাচারের অভ্যুত্থান ঘটে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সামরিক চক্রের সহায়তায় সে শক্তি পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাষট্টি, ছেষট্টি, উনসত্তর ও সত্তর সালে ক্রমাগত আন্দোলন ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; কিন্তু বাঙালি ক্ষমতার পরিবর্তে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান এবং বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞের শিকার হয়।

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অপরিমেয় আত্মদান এবং তুলনাবিহীন বিক্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাঙালি তার মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। বাংলাদেশের সংবিধানে ৩ নম্বর ধারায় একটি ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল বাক্য 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা'। বিশ শতকের সত্তর দশকে

ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন ও বাংলা ভাষা

পবিত্র সরকার

ভূমিকা

আমরা সবাই যেমন জানি, যে-কোনো ভাষা মূলত একটি ভূমিবদ্ধ, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রোথিত সত্তা হিসেবে থাকে। অনেক সময় তার রাষ্ট্রিক সীমাও চিহ্নিত থাকে। কিন্তু ইতিহাসের কালধারায় সেই ভাষা কখনও কখনও নিজের ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক সীমা অতিক্রম করে যায়। বিপরীতক্রমে, সেই সীমানা ভেঙে বাইরে থেকে অন্য ভাষা এসে তাকে স্পর্শ করে। অর্থাৎ বহির্গমন হোক আর আমন্ত্রণ হোক, বৃহৎ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন খুব দুরধিগম্য অঞ্চলের ভাষা নাহলে একটি ভাষা আর তার নিজের শিকড়ে বা শিবিরে আমূল বদ্ধ থাকে না, তার মধ্যে নানারকম চলাচল ঘটে।

এই চলাচলের সূত্রগুলিকে আমরা এখন লক্ষ করি। প্রথম সূত্র, ভাষার বহির্গমন বা exodus। ভাষার বহির্গমন মানে ভাষার বক্তাদের বহির্গমন। এমন প্রাগিতিহাসেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে ককেশীয় পর্বতের পাদদেশ থেকে নতুন পশুচারণ ভূমির সন্ধানে ওই ভাষার আদিভাষীরা বেরিয়ে পড়েছিল পশ্চিমে ও পূর্বে, এখন যেমন বাংলাভাষার সন্তানেরা নানা দেশে যাচ্ছে সচ্ছল জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। ভাষার এমন চলাচলের নাম দেওয়া যাক 'অভিবাসী আন্তর্জাতিকায়ন'।

অভিবাসী আন্তর্জাতিকায়ন ও ভাষার ভবিতব্য

কিন্তু এই অভিবাসনের ফলে আন্তর্জাতিকায়নের মধ্যে একটা বিপদও আছে। অভিবাসীরা যদি দলে ভারী হয়, এবং সেই দল একসঙ্গে একই জায়গায় বাস করে, তবে অভিবাসনের দেশে সেই ভাষা রক্ষা করা কিছুটা সহজ। তাও নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, অভিবাসিত দেশে এই বহিরাগত ভাষাটি সম্বন্ধে কোনো বিরোধ নেই, বরং সহিষ্ণুতার মনোভাব আছে–এ রকম একটি পরিবেশ দরকার। এক সময় মার্কিন দেশে এক মাত্র ইংরেজি চলবে, অন্য কোনো ভাষা সহ্য করা হবে না, এই নীতির ফলে ইউরোপের বহু অভিবাসী–ফরাসি, জার্মানি, নরোয়েজিয়ান, আইরিশ প্রভৃতি এ দেশে এসে তাদের ভাষাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ১৯১৯ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থিয়োডর রুজভেল্টের মন্তব্যটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণেআছে –"এখানে আমাদের একটিমাত্র ভাষারই স্থান আছে, আর সে ভাষা ইংরেজি, কারণ আমরা দেখতে চাই যে, দেশের ঢালাইয়ের পাত্রে আমাদের দেশের মানুষগুলি আমেরিকান হয়ে তৈরি হচ্ছে, কোনো বহুভাষী বোর্ডিং হাউসের বাসিন্দা হিসেবে নয়।" এই সব কথায় উৎসাহিত হয়ে আমেরিকায় Only English নামে একটি আন্দোলনও কিছুদিন শোরগোল তৈরি করেছিল, যদিও তা বেশি সমর্থন পায়নি (Crawford, 1992, এবং সরকার, ২০১৩:২৯৫-৩০৮দ্র.)। বাংলাভাষীদের ভৌগোলিক বিস্তারের ফলে এই আন্তর্জাতিকায়ন ঘটে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়ায়েত , ওমান, কাতার , বাহরিন, জর্ডান ইত্যাদি দেশে বাঙালিরা ছড়িয়ে পড়েছে, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বেশ কিছু দেশে তারা পৌঁছে গেছে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই আন্তর্জাতিকায়ন বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়নের সহায়ক, কিন্তু তা নানা অনুকূল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সে পরিস্থিতি না থাকলে অভিবাসীদের বাংলা ভাষা লুপ্তও হতে পারে।

নতুন ভাষা অভিবাসী হয়ে যেখানেই যাক, সেখানকার ভাষা বা ভাষাগুলিতে নবাগত আর-একটি ভাষার যোগ হয়, ফলে সেখানেই বহুভাষিকতা (multilingualism) সৃষ্টি হয় বা বিস্তার ঘটে। এই বহুভাষিকতা প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন ভাষার জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে সৃষ্ট, এমন হতেই পারে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে যেমন ঘটেছে। ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলয়েড–এই চারটি বড়ো ভাষাপরিবার এখানে তাদের নানা বিবর্তিত ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থিত আর আরও প্রাচীন নেগ্রিটো বংশেরও কিছু স্মৃতিচিহ্ন থেকে গেছে আন্দামানের ভাষায়। আবার এই বহুভাষিকতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টিও হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ স্থাপনের ফলে আমেরিকার দুই মহাদেশ বা অস্ট্রেলিয়াতে যেমন ঘটেছে।

কিন্তু যখনই আর যেভাবেই বহুভাষিকতা ঘটুক, একটি রাজনৈতিক ভাবে চিহ্নিত অঞ্চলে বা রাষ্ট্রে একাধিক ভাষার অস্তিত্ব থাকলেই সে ভাষাগুলির মধ্যে একটা আধিপত্য ও শক্তিগত স্তরন্যাস (hierarchy) তৈরি হয়। যে ভাষাটি অধিক শক্তিশালী এবং রাষ্ট্রের মূল জনগোষ্ঠী ও প্রশাসনের সমর্থনপুষ্ট, হয়তো অর্থনৈতিক ভাবেও শক্তিশালী, কারণ তা হয়তো একই সঙ্গে সে দেশের বাণিজ্য এবং জীবিকারও ভাষা–তখন তার কাছে অন্য বহিরাগত ভাষাটি বা ভাষাগুলি তুলনায় দুর্বল থাকে।

সে ভাষাটি হয় শীর্ষভাষা বা acrolect, আবার কিছু ভাষা হয় মধ্যভাষা বা mesolect, আবার কোনো কোনো ভাষা থাকে তলায় পড়ে, তলভাষা বা basilect হয়ে।

যে-কোনো বহুভাষী দেশে ভাষার শক্তির এই ক্রম ভাষার রক্ষণ (maintenance) ও ক্ষয়ের (loss) সম্ভাবনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ শক্তি ও আধিপত্যের স্তরন্যাসে ভাষার শক্তি যত বেশি, তার মৃত্যুর সম্ভাবনা তত কম, আর শক্তি যত কম (হয়তো একটিমাত্র পরিবার গিয়ে পড়েছে শক্তিশালী অন্যভাষীদের মধ্যে), তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে। বহির্গামী বা অভিবাসী ভাষার, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকায়িত ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার শক্তি আর রক্ষণ ও ক্ষয়ের এই সচল অনুপাতটি সাধারণভাবে কার্যকর থাকে।

কিন্তু এও একটি সরলীকৃত বিবৃতি। ভাষার শক্তি শুধু জনসংখ্যার হিসেবে হয় না, কিংবা ওই ভাষার বক্তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির হিসেবে হয় না। অন্যভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন একটি পরিবারও নিজের ভাষা বাজায় রাখতে পারে, যদি সেই পরিবার নিজেদের মধ্যে ভাষাটি বলার ইচ্ছা ত্যাগ না করে, 'আমার ভাষাটা আর কোনো কাজে লাগবে না'- ধরনের মনোভাব থেকে অন্য ভাষাকে গ্রহণ না করে সে দেশের শক্তিশালী জনস্রোতে মিশে যাবার চেষ্টা না করে।

এই নতুন প্রযুক্তির যুগে প্রাণপণে নিজের ভাষা বাঁচিয়ে পরিবারকে সাহায্য করার অনেক উপায় তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যে স্বভাষায় কথা বলা ছাড়াও সিডিতে, ডিভিডিতে, ইন্টারনেটে পরিবারটি নিজের দেশ ও ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। মুদ্রিত বইপত্রের কথা তো ছেড়েই দিলাম– তা মুদ্রিত আকারে এবং কম্পিউটারে পাওয়া যেতেই পারে। অর্থাৎ একটি ভাষার যতরকম ব্যবহার আছে–বলা, শোনা, পড়া, একই সঙ্গে ডিভিডিতে দেখা ও শোনা–সবকিছুই এখন অভিবাসী ভাষার কাছেও সেই ভাষার বক্তাদের কাছে অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে। ফলে যিনি আন্তর্জাতিকায়িত এবং বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে নিজের ভাষাকে রক্ষা করতে চাইবেন,তার জন্য সহায়ক নানা প্রযুক্তি অবশ্যই হাজির আছে। এ ক্ষেত্রে চাওয়ার মনস্তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

বলা বাহুল্য, যেখানে বহিরাগত ভাষার জনগোষ্ঠী অনেক বড়ো এবং একটি অঞ্চলে কমবেশি সংহত, সেখানে ভাষা রক্ষণের সমস্যা তুলনায় সহজতর। কারণ অভিবাসী এই গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, আদান-প্রদান, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সূত্রে আপন ভাষার চর্চা অব্যাহত রাখতে পারেন। শুধু তাই নয়, মুদ্রণ-প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পত্রিকা ও বই প্রকাশ করতে পারেন–লন্ডন, নিউইয়র্ক, টোরান্টো ইত্যাদি শহরে বাংলাদেশি অভিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে যেমন করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, শুনেছি কোথাও কোথাও বৈদ্যুতিক শ্রবণ এবং দর্শন-প্রতিবেশ (listening and viewing environment) রচনা করেছেন বাংলা রেডিয়ো স্টেশন এবং টেলিভিশন চ্যানেল চালু করে। এসব প্রয়াসই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভিবাসী বাংলাভাষার রক্ষণের সহায়ক। কোথাও কোথাও (নিউইয়র্ক এবং লন্ডন ও তার আশেপাশে যেমন) এমনকি বাংলাভাষা এক ধরনের প্রশাসনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছে, প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় খরচে তার জন্য পাঠ্য বই তৈরি হয়েছে।

এতে এই সুবিধে হয়েছে যে, অভিবাসী বাংলা ভাষার ব্যবহারকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও প্রবাহিত করা আংশিক হলেও কিছুটা সম্ভব হচ্ছে। কী পরিমাণে এবং কতটা সে ভাষা রক্ষিত হবে তা অবশ্যই অভিভাবকদের ইচ্ছা এবং অভিবাসীদের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। যেখানে নিজের দেশেই (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র) নাগরিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত স্তরে বাংলাভাষার অবমূল্যায়ন ঘটছে, সেখানে বিদেশে অভিবাসী ভাষার শক্তি, মর্যাদা ও আয়ুষ্কাল কতটা রক্ষা এবং বিস্তারিত করা হবে তার সিদ্ধান্ত অভিবাসী বক্তাদেরই নিতে হবে।

আগমনি আন্তর্জাতিকায়ন

এবার ভাষার অভিবাসী আন্তর্জাতিকায়নের বিপরীত ছবিটা আমরা লক্ষ করি। এখানে আমার ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন ঘটছে অন্য দেশ থেকে আগত একটি ভাষার সংযোগে, যে ভাষা-সংযোগকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে contact situation বলা হয়। যেহেতু বহিরাগত ভাষাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য দেশে প্রচলিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি 'আন্তর্জাতিক' ভাষা, সেহেতু আমার নিতান্ত দেশি বা প্রাদেশিক ভাষা একটি আন্তর্জাতিক ভাষার ছোঁওয়া পেল, ফলে তাতে খানিকটা আন্তর্জাতিকতা যুক্ত হল–এই রকম একটা দুর্বল যুক্তি খাড়া করা যায়।

প্রাচীনযুগে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে সাম্রাজ্যের বা অভিবাসীদের দ্বারা আনীত হয়েছিল 'আর্য ভাষা', কখনও বা গ্রিক ভাষা। আর্য ভাষা আমরা বাঙালিরা আরও অনেকের সঙ্গে

গ্রহণ করেছি, গ্রিক ভাষার দু-একটা শব্দ আমাদের ভাষায় টিকে আছে। ধর্ম বিস্তারের সূত্রে একদিকে ইরান আর অন্যদিকে মিশর পেয়েছিল আরবি, কোরিয়া আর চিন পেয়েছিল চিনা ভাষা।কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে সাম্রাজ্যবাদের সূত্রে উত্তর আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া (এবং সারা পৃথিবীর আরও অনেক অঞ্চল) পেল ইংরেজি, দক্ষিণ আমেরিকা পেল স্প্যানিশ।

আবার আমরা লক্ষ করি, ভাষার সেই স্তরন্যাসের (hierarchy)-র সূত্র এখানেও খাটে, অর্থাৎ একটি বহিরাগত ভাষা আগমনের ফলেও বহুভাষিকতার উদ্ভব হয়, এবং বহুভাষিকতা দেশের মধ্যে ভাষার নতুন স্তরন্যাস দাবি করে। কিন্তু ইউরোপের কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর নানা অংশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে যে ভাষাটি ওই উপনিবেশগুলিতে প্রবেশ করে, সেটি একটি সাম্রাজ্যের শক্তিশালী ভাষা, কাজেই উপনিবেশের অন্য সব ভাষাগুলির মাথার উপরে সেটি স্থাপিত হয়। অন্য ভাষাগুলির ইংরেজি নাম হয় vernacular, যার লাতিন অর্থ ছিল ক্রীতদাসদের ভাষা। অর্থাৎ এখানে বহিরাগত ভাষাটিই হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের acrolect, দেশের নিজস্ব ভাষাগুলি সে তুলনায় নীচু স্থান পায়, কিছু হয় মাঝারি ভাষা, কিছু তলার ভাষা। অভিবাসী আন্তর্জাতিকায়নে এর ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটে। সেখানে আমাদের ভাষা অন্য দেশেই পৌঁছায় কিছুটা প্রার্থী হিসেবে, কুণ্ঠিত ভাবে, সেখানকার আধিপত্যকারী ভাষার পাশে দরিদ্র একটু স্থান লাভের আশা নিয়ে। কখনও সে স্থান জোটে না বলে অভিবাসী ভাষা লুপ্ত হয়, তাও আমরা দেখেছি। অর্থাৎ ঘরেই থাকুক, আর বাইরেই যাক, বাংলার মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের ভাষার স্থান কখনোই সাম্রাজ্যের ভাষার মতো 'বৈশ্বিক' বা global চরিত্র পায় না। সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম কাল (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ) পর্যন্ত এই প্রত্যাশা বাংলাভাষীদের মধ্যে তৈরি হওয়ার মতো প্রতিবেশ ছিল না।

প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনে হোক, কিংবা গত শতাব্দীর নব্বইয়ের বছরগুলি থেকে আরম্ভ আগ্রাসী বিশ্বায়নের ফলেই হোক, বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কারণ ইংরেজি একসময়ে ছিল 'রাজভাষা' (বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে ইংরেজি শেখানোর জন্য প্রকাশিত একটি বই ছিল এই নামে), তা না শিখলে সরকারি চাকরি পাওয়া যেত না। প্রথম দিকে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাতেও ইংরেজি পড়ানো হত (এখনও হয়), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৯ পর্যন্ত মাধ্যমিকে বাংলা ছাড়া অন্য বিষয় ইংরেজিতে পড়া ছিল বাধ্যতার অন্তর্গত, যদিও বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৯-এই মারাঠিকে মধ্যশিক্ষার বাহন করেছিল। উচ্চশিক্ষা থেকে এখনও আমরা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজিকে স্থানচ্যুত করতে পারিনি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাধ্যম হিসেবে তার দাপট আরও বেশি। বিশ্বায়নের করপোরেট সংস্কৃতি এবং চাকরির বিশ্বব্যাপী বাজার, জাহাজ-চালনা, বিমান-চালনা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদিতে ইংরেজির ব্যাপক ব্যবহার, এবং সচ্ছল উপার্জন ও চাকরির অন্বেষণে বাংলাভাষীদের বহির্গমনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ততাকামী (proto-elite), সামাজিকভাবে ঊর্ধ্বগামী (upwardly mobile) মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি সমাজ-পরিবেশে ইংরেজির শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। শক্তির দিক থেকে ইংরেজি হয়েছে মহাজন ভাষা, বাংলা এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় ভাষা তার খাতক। এই আন্তর্জাতিকীকরণের মূল বৈশিষ্ট্য হল বাংলার দু-হাত পেতে ইংরেজির কাছ থেকে গ্রহণ।

এর ফলে বাংলাভাষায় প্রচুর ইংরেজি ও বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে শব্দঋণ (loanward) হিসেবে। ১৯২৬-এ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিসেবে (আসলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের হিসেবে) তা ছিল বাংলার মোট শব্দাবলির ১.২৫ শতাংশ (Chatterji, 1926 : 218)। এখন নিশ্চয়ই এই শব্দঋনের অনুপাত আরও বেড়েছে। কিন্তু তাতেও বাংলার তুলনায় ইংরেজির আধিপত্য স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত, কারণ দুটি ভাষা পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে, তবে হস্তমর্দনকারী সমকক্ষ হিসেবে নয়, দাতা আর গ্রহীতা হিসেবে। ফলে বাংলাভাষার ইংরেজি শব্দের পরিমাণ যত বেশি (লিখিত ও মৌখিক ভাষায়, প্রমিত ও উপভাষার পরিমাণের পার্থক্য হিসেবে ধরেও), ইংরেজি ভাষায় বাংলা শব্দের পরিমাণ সে তুলনায় অতি যৎ কিঞ্চিৎ--- চার-পাঁচটি মাত্র।

তা ছাড়া ইংরেজিভাষার এই বাহুবলের প্রমাণ পাই লেখাপড়া-করা সাধারণ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত বাঙালির দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও। আমরা যাকে বুলি-মিশ্রণ আর বুলি-লম্ফন ('বুমিবুল', দ্র। সরকার, ২০১৩, ১৮৪-২০৩), বাংলায় তার প্রকোপ বেড়েছে। কথায় কথায় আমরা ইংরেজি শব্দ বাংলা বাক্যের মধ্যে ছিটিয়ে দিই, এবং বাংলা কথার মধ্যে ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করে অন্যদের অভিভূত করার চেষ্টা করি। এর সবচেয়ে নিদর্শনমূলক দৃষ্টান্তটি নির্মাণ করে গিয়েছেন ইংরেজিতে অসাধারণ পারদর্শী এক বাঙালি কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) থেকে এই অংশটি

নানা উপলক্ষ্যে বার বার উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন-

> [নব এবং কালীর প্রবেশ]
> সকলে/ [সকলে গাত্রোত্থান করিয়া] হিপ হিপ হুরে।
> কালী। [প্রমত্তভাবে] হুরে, হুরে।
> নব। বসো ভাই, সকলে বসো। (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের একটু এক্‌সকিউজ করতে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে আসতে দেরি হয়ে গেল।
> শিবু। [প্রমত্তভাবে] দ্যাট্‌স এ লাই।
> নব। [ক্রুদ্ধভাবে] হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বলো ? তুমি জান না, আমি তোমাকে এখুনি শুট করবো?
> চৈতন। [নবকে ধরিয়া বসাইয়া] হাঃ, যেতে দাও, যেতে দেও, এমন ট্রাইফলীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন ?
> নব।-- ও আমাকে লাইয়র বললে--- আবার ট্রাইফলীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু--- লাইয়র--- এর বরদাস্ত হয় ? (গুপ্ত, সম্পা।, : ২৫০)।

অর্থাৎ বাংলা 'মিথ্যাবাদী' বললে গায়ে লাগে না, কিন্তু ইংরেজি 'লাইয়র' বললে তা অসহ্য হয়। দুটি ভাষার পারস্পরিক প্রতাপের এ এক নির্ভুল উদাহরণ মধুসূদনের নাটক থেকে পাই।

আমরা এমন বলি না যে, বাংলাভাষার সঙ্গে ইংরেজির এই সংযোগ সর্বাংশে নেতিবাচক ফল উৎপাদন করেছে। এই "আন্তর্জাতিকীকরণের'–যদি একে তাই বলা যায়–এর ফলে বাংলা ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্য বেড়েছে, বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি ঘটেছে–সে সবের কম-বেশি উচ্ছসিত ইতিবৃত্ত অনেকেই রচনা করেছেন। এবং পরবর্তীকালে বাংলার যে আর-এক ধরনের আন্তর্জাতিকায়ন ঘটেছে তার মূলে আছে ইংরেজির মধ্য দিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সাহিত্য-দর্শন, ইহবাদী আধুনিক শিক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার চর্চা। আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে ঋণগ্রহণের বিরুদ্ধে নই, ভাষাগত বিশুদ্ধিবাদীও নই। কিন্তু যে তথাকথিত 'আন্তর্জাতিকতা' ভাষার চরিত্রকে বিকৃত করে, তার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ গৌরববোধ করতে চাই না। অভিবাসী আন্তর্জাতিকায়নে ভাষা তবু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে, প্রতিকূল পরিবেশে কিছুটা জায়গা দখল করতে চায়। কিন্তু এই আগমনি আন্তর্জাতিকায়ন একটি অক্রিয় বা passive প্রয়াস। খাতক ভাষা মহাজন ভাষার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তা প্রতিরোধ করবার কোনো চেষ্টাই সে করে না। ফলে এই আন্তর্জাতিকায়ন যথার্থভাবে তা নয়, বাংলাভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সূচক নয়।

উপরের দু ধরণের আন্তর্জাতিকায়নের কোনোটিই সে অর্থে বাংলাভাষার আন্তর্জাতিককায়নের সূচক নয়। অভিবাসী বাংলা ভাষার ব্যবহার, মৌখিক হোক, লিখিত হোক, মূলত বাঙালি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করুন, বা স্কুলে বাংলা পাঠ্যতালিকাভুক্ত করুন, সে সম্বন্ধে এই কথাই বলতে হবে। অন্যদিকে অভিবাসী বাঙালিদের বিদেশি স্ত্রী বা স্বামীরা বাংলা শিখলে তাঁরাও এই ভাষাগোষ্ঠীর আংশিক সদস্য হয়ে যান, তার বেশি নয়। আর আগমনি আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে বাংলা ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক, তাতে যতই ইংরেজি বা বিদেশি শব্দ ঢুকুক, সে ভাষাও বাঙালি ভাষাগোষ্ঠীর সীমানা অতিক্রম করে না। এ দুটিকে ভুয়ো আন্তর্জাতিকায়ন বা pseudointernationalization বললে হয়তো তা একটু নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণের যে ছবি তৈরি করা হয় তা সংগত নয়।

যথার্থ আন্তর্জাতিককায়ন

ওই দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে বাংলার আন্তর্জাতিককায়নের আর-একটা অর্থ আমরা এখানে স্থাপন করতে চাই। আমাদের মতে এটাই বাংলার আন্তর্জাতিকায়নের যথার্থ রূপ। বাংলা ভাষার এই আন্তর্জাতিকায়ন হল তা বিশ্বব্যাপী পরিচয় ও মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। এর পরিণাম হিসেবে তা শেখার জন্য সারা পৃথিবীর নানাভাষী মানুষের আগ্রহ ও প্রয়াস, তার পরিমাণ যতই ছোটো হোক। এই সাক্ষ্যগুলির মধ্যেই বাংলা ভাষা যে শুধু বাঙালির সম্পত্তি নয়, তা যে সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে একটি মূল্যবান অর্জন, তা ক্রমশ স্বীকৃত হতে থাকে। যদিও বাংলা এখনও রাষ্ট্রসংঘের সরকারি বিশ্বভাষা নয় (যার মধ্যে আছে ইংরেজি, চিনা, আরবি, স্প্যানিশ, রুশ), কিন্তু আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের প্রয়োজনে বাংলাভাষা শিখতে আগ্রহী হচ্ছে, অর্থাৎ তারা বাংলাভাষাকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব বা কার্যকলাপের জন্য জরুরি মনে করছে, এর মধ্যে এক ধরনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঘটছে বাংলাভাষার। এই প্রাতিষ্ঠানিক আন্তর্জাতিকতার রূপগুলি এই রকম –

১. আন্তর্জাতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : যেমন খ্রিস্টধর্মের প্রচারে বিদেশি পাদরিদের বাংলা শিখে বাংলার ব্যবহার। অবশ্যই অন্যান্য বহু ভাষার ক্ষেত্রেও এ ধরনের আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছে। অতি ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংস্থার কাজে বাংলাভাষার ব্যবহার : যেমন বহুজাতিক 'কর্পোরেট হাউস' গুলি অন্তত বাংলাদেশে তাদের উৎপাদিত জিনিসের মোড়কে বাংলা নাম ছাপে-ওষুধ হোক, সাবান হোক, টুথ পেস্ট হোক, নরম পানীয় হোক। ভারতে যদিও সেটা সম্ভব হয়নি এখনও।

বাংলা বা যে কোনো ভাষার এই দু ধরনের আন্তর্জাতিকায়ন ঘটে প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের ধর্মীয় বা বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য, এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। একটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীকে তারা বিশ্বাস বা পণ্যবিক্রয়ের জন্য দখল করতে চয়। কিন্তু এর ফলে বাংলাভাষার উপর আন্তর্জাতিক নজর পড়ে, আর তাতে শক্তি ও মর্যাদা বাড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিকভাবে আর-এক ধরনের আন্তর্জাতিকায়নের সহায় হয় সাহিত্য। বাংলার এক জন কবি নোবেল পুরস্কার পাওয়া এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে, তা আমরা জানি। যদিও রবীন্দ্রনাথের আগেই বঙ্কিমচন্দ্র বা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, ১৯১৩-তে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র নোবেল পুরস্কার পাওয়া এমন একটি ঘটনা যা সারা পৃথিবীকে সচকিত করে বাংলাভাষাকে পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক মুহূর্তে তুলে আনে। ফলে রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর যে ভাষাতেই অনুদিত হোক, তা পৃথিবীর সাহিত্য-উত্তরাধিকারে বাংলার উপস্থিতি সুনিশ্চিত করে। যাঁরা এই পুরস্কার বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাননি, অথচ বাংলা সাহিত্যের বরণীয় স্রষ্টা, যেমন নজরুল, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, তাঁদের অনুবাদও ওই আন্তর্জাতিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ হয়ে যায়। এর পারে (ভারত ও বাংলাদেশের) যে বাঙ্গালি লেখকেরা এমনকি ইংরেজিতেও সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা সাহিত্যে বাঙালির সৃষ্টিশীলতার এক ধারাবাহিকতা নির্মাণ করেন। তাঁদের জীবনপটভূমিতে বাংলার অবস্থানের কথা সারা পৃথিবীর পাঠকেরা জানে, ফলে বাংলার পরিচিতিও প্রসারিত হয়। এ ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর মতো বাংলাভাষার চলচিত্র যখন বিশ্বের নানা উৎসবে নানা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে, রামেন্দু মজুমদার, নাসিরুদ্দীন ইউসুফ ও অন্যান্যদের বাংলা নাটক যখন এডিনবরা বা অন্যত্র আন্তর্জাতিক প্রদর্শনের সুযোগ পায় ও প্রশংসিত হয়, তখনও বাংলাভাষাই একভাবে আন্তর্জাতিক নজর পায়। এখানে আন্তর্জাতিক পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের যে স্বার্থ জড়িত, তা ধর্মীয় বা বাণিজ্যিক স্বার্থ ততটা নয়, কিন্তু তা পৃথিবীর মানুষের এক মানসিক ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক সম্পদকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার চেষ্টা।

এই নানারকম আন্তর্জাতিক মনোযোগই সারা পৃথিবীর বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রেও বাংলাভাষার স্বীকৃতি আদায় করেছে। অমর্ত্য সেন কিংবা ড. ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেলে পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। লন্ডন, শিকাগো, কর্নেল, নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, জার্মানির মাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়, তোকিয়ো ও ওসাকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে বাংলা পড়ানো হয়। কোথাও কোথাও স্থায়ী ভাবে, আরও অন্যত্র অস্থায়ীভাবে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ নাগাদ সুনীতিকুমারের বাংলাভাষা সম্পর্কে গবেষণা, পরে 'ওডিবিএল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়ে সারা পৃথিবীতে বাংলাভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি অধ্যাপকদের গবেষকদের, এমনকি ব্যবসায়ী ও কর্মীদের সাফল্য, যেমন অমর্ত্য সেন বা তপন রায়চৌধুরী, স্থপতি ফজলুর রহমান খান প্রভৃতির কীর্তি, বাঙালির সঙ্গে বাংলাভাষারও গৌরব বাড়ায়। বাংলাভাষী অঞ্চলের নানা বিষয় নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা হয়, যেমন এডোয়ার্ড ডিমক করেছেন সহজিয়া ধর্ম নিয়ে, র‍্যাল্‌ফ নিকোলাস করেছেন বাংলার লৌকিক দেবদেবী নিয়ে, কিন্টন বি সিলি করেছেন জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে। বাংলা ভাষা নিয়ে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চমস্কির গুরু জেলিগ হ্যারিসের কাছে সেই ১৯৪৫-এই গবেষণা করেছিলেন চার্লস ফারগুসন। এ ধরনের তালিকা অন্তহীন দৈর্ঘ্যের দাবিদার। কিন্তু বাংলাভাষার আন্তর্জাতিককায়নের যেটি রাজনৈতিক ভিত্তি, সেটি স্থাপন করেছে নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পূর্ব-পাকিস্তান পর্বে ভাষা-আন্দোলনে, ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের আত্মদানে, এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করে, সে যুদ্ধে গৌরবময় বিজয়ের পর যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়, তা বাংলাভাষার জন্য এক অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক সম্মান ছিনিয়ে নেয়-বাংলা একটি স্বাধীন

গণপ্রজাতন্ত্রের জাতীয় এবং প্রশাসনিক ভাষা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রসংঘে বাংলাভাষায় বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্বোধন করেন, সে প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে প্রথম বাংলাভাষা প্রতিধ্বনিত হয়।

তবে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়নের শেষ মহৎ পথচিহ্নটি সম্ভবত স্থাপিত হল ১৯৯৯ সাল থেকে। হল ক্যানাডা-প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের চেষ্টায় ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহায়তায়, পরের বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক শাখা বা ইউনেস্কো। আমার ভাষার আন্তর্জাতিকায়নের ক্ষেত্রে এই ঘটনার গুরুত্ব প্রায় নোবেল প্রাইজের মতোই। কারণ চিরন্তন সাহিত্যের মতোই এই দিবসও পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরত্ব লাভ করবে।

অন্তকথা

আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমতো বাংলাভাষার আন্তর্জাতিকায়নের একটি রূপরেখা আমরা এই নিবন্ধে নির্মাণ করেছি। প্রশ্ন হল, বাংলাভাষা কীভাবে কতটা আন্তর্জাতিক তা জানার মধ্যেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় কি না। দ্বিতীয়ত, বাংলার এই সীমাবদ্ধ আন্তর্জাতিক চরিত্রের আরও কোনো কোনো বিস্তার বা উন্নতি ঘটানো যায় কি না। এ দিকে একটা সম্ভাবনা হতে পারে বাংলাকে রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম আদান-প্রদানের ভাষা হিসেবে দাবি করা। এ কাজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক উদ্যোগের মুখাপেক্ষী, সাধারণ বাঙালি নাগরিক কেবল রাষ্ট্রকেই এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারে। এ কাজ খুব সহজ হবে না, কারণ জাপানি, হিন্দি, জার্মান ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে জল্পনা আপাতত অপ্রাসঙ্গিক।

অর্থাৎ যে-অনড় বাস্তবের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করা দরকার তা হল, বহুভাষিক দেশে নানা ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, বিশ্বগত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও তেমনই, একটি স্তরন্যাস বা hierarchy তৈরি হয়ে যায়। সেখানেও কোনো (কোনো) ভাষা শীর্ষভাষা বা acrolect-এর স্থান নেয়, আবার কোনো ভাষা মধ্যভাষা বা mesilect-এর উপরে উঠতে পারে না। ইউনেস্কো স্বীকৃত ভাষাগুলির মধ্যেও global language হিসেবে ইংরেজির যে বিস্তার ও শক্তি, ফরাসি বা স্প্যানিশের, বা অন্য ভাষাগুলির তা নেই। ইংরেজি এই অধিষ্ঠানের পিছনে তার সাম্রাজ্যের ইতিহাস যেমন আছে তেমনই আছে আধুনিক বাণিজ্যিক বিশ্বায়নে তার ব্যাপক ব্যবহার। ইতিহাসের এই সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে অন্য কোনো ভাষা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোনোদিন সমকক্ষ হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাংলাভাষা-আন্তর্জাতিক শীর্ষভাষা হোক বা না হোক, তার আন্তর্জাতিকতা যত অসম্পূর্ণ হোক-তা যেন বাংলার চরিত্র বজায় রাখে, ভুয়ো আন্তর্জাতিককায়নের ফলে ইংরেজি বা হিন্দির ঢালাও মিশ্রণে কোনো খিচুড়ি ভাষায় পরিণত না হয়। তা দেখার কাজ রাষ্ট্রের কতটা জানি না, সাধারণ বাঙালির তার চেয়ে অনেক বেশি। তাকে প্রতি মুহূর্তে কথা বলার সময়, ছেলেমেয়েদের ভাষাশিক্ষাদানের সময় এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে কথায় ইংরেজি শব্দ বা বাক্যের মিশেল বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণের কোনো যথার্থ চিহ্ন নয়। বরং তা আমাদের ঔপনিবেশিক হীনমন্যতার চিহ্ন। আমরা জানি বাঙালি মুখের ভাষার ব্যবহারে যত খিচুড়ি পাকায়, লিখিত ভাষায় ততটা তা করে না, কারণ মুখের ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষা বেশি রক্ষণশীল। তবু এ বিষয়ে প্রত্যেক বাঙালির প্রতিমুহূর্তে সচেতন এবং সতর্ক থাকা উচিত।

সূত্রপঞ্জি

গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.)। '*মধুসূদন গ্রন্থাবলী*,' কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

সরকার, পবিত্র। ২০১৩। '*চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান*,' কলকাতা পুনশ্চ।

Chatterji, Suniti Kumar. 1926. *The Origin and the Development of the Bengali Language*. Calcutta: University of Calcutta.

Crawfore, James (ed). 1992. *Language Loyalties*, University of Chicago Press.

আমার মাতৃভাষা : চাকমা

সুগত চাকমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে গিরি, নির্ঝরণী, হ্রদ এবং অরণ্যের মায়াবী লীলানিকেতন পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে নানা জাতিগোষ্ঠী। তাদের ভাষা ও লোকসাহিত্য এ দেশের অমূল্য মানব সম্পদ। এ সকল ভাষায় কেবল বড়দের জন্য নয়, এগুলিতে শিশুতোষ ও শিশুদের শিক্ষণীয় বহু চিত্তাকর্ষক উপাদান রয়েছে। কিন্তু এগুলি এতকাল অনাবিষ্কৃত থাকায় এগুলির সঙ্গে অনেকের তেমন পরিচয় নেই। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আইন প্রণয়ন করে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে ভিত্তি করে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে *মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা* দানের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। ১৯৭৮ সনে রাঙ্গামাটিতে সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠার পর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষা (ককবরক) শিক্ষাদানের কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে চালু করা হয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। ব্র্যাক চাক্মা ভাষায় ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই *উচ্ছফচ্ছয় পরানাহ্* প্রকাশ করেছে। এ সংস্থা পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ে এ বই পড়ানো হয়। রাঙ্গামাটি-র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট *চাকমা দ্বিতীয় পাঠ* গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষা উন্নয়নে এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

ভাষিক দৃষ্টিভঙ্গি

কোনো জাতিগোষ্ঠীর ভাষা বেঁচে না থাকলে তাদের সংস্কৃতি বাঁচে না। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হলে ভাষাভষিক বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে এগিয়ে আসার ও সহযোগিতাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বৈচিত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি এ সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-আর্য (Indro-Aryan) শাখার ভাষা হিসেবে চাকমা ভাষাটি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। ১৯৭০-এর দশকে চাকমা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল। নবীন প্রজন্মের চাকমা কবি ও সাহিত্যিকেরা প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও কল্পনা নিজেদের মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

চাকমা ভাষা-অঞ্চল

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান পাহাড়ি অধিবাসী হলো চাকমা জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠী। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি – এ দুটি পার্বত্য জেলায় চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এতদঞ্চলে তাদের নামে উপজাতীয় রাজা কেন্দ্রিক চাকমা সার্কেল রয়েছে। চাকমারা বাইরের লোকদের কাছে চাকমা নামে পরিচিত হলেও তারা নিজেদেরকে 'চাঙমা/চাংমা' বলে থাকে। ২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী এ দুটি জেলায় চাকমাদের জনসংখ্যা হলো ৪,২২,৪০৫ (*দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৭ জুলাই ও ১৭ আগস্ট সংখ্যাদ্বয়)। বান্দরবান জেলায় মারমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সেখানেও চাকমাদের বসবাস রয়েছে। দক্ষিণ দিকে চাকমাভাষীদের বিস্তৃতি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পর্যন্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে চাকরি ও নানা কাজে অনেক চাকমা বসবাস করে। বস্তুত, বাংলাদেশে নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে সংখ্যাগত বিচারে বাংলাভাষীদের পরেই চাকমাভাষীদের স্থান।

শ্রেণিকরণ

চাকমা ভাষা গঠনসূত্র (typology) চাকমা ভাষার বাক্যিক গঠন সাধিত ভাষার মধ্যে পড়ে। এতে ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল অনুযায়ী ক্রিয়ামূলের সাথে পুরুষ ও বচনভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, গর্ + অন্ = গরন (তারা করে)। বর্তমানকালের সাধারণ বর্তমানে ক্রিয়ার রূপে বহুবচনে -অন্ ক্রিয়াবিভক্তি ক্রিয়ামূল 'গর্'- এর সাথে যুক্ত হয়। এটি একবচন হলে হয় গর্ + এ = গরে (সে করে অর্থে)।

ধ্বনি, শ্বাসাঘাত, শব্দগঠন ও বাক্যগঠন প্রক্রিয়া

মৌখিক স্বরধ্বনি : চাকমাতে এ জাতীয় স্বরধ্বনি হলো সাতটি : ই /i/, এ /e/, এ্যা / ɛ/, আ /a/, অ /ɔ/, ও /o/, উ /u/। এখানে উদাহরণ ধ্বনিগুলি ব্যবহার দেখানো হলো : *ইজর* /iɟɔr/ (মাচানঘরের সামনের খোলা অংশ বিশেষ), এত্তুমুয়া /et̪t̪umwa/ (এত বড়), অ্যাগাপরা /ɛgapɔra/ (সহনশীলতার সীমাবৃদ্ধি), আদাম /adam/ (গ্রাম, পাড়া) , অজল /ɔɟɔl/ (উঁচু), ওল /ol/ (দিকভ্রান্ত), উগুন /ugun/ (উকুন)।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি : মৌখিক স্বরধ্বনিগুলির পাশাপাশি চারটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি রয়েছে : ইঁ/ / ĩ/, এঁ্যা /ɛ̃/ আঁ /ã/, উঁ /ũ/ চাকমাতে পাওয়া যায় যেমন , ইঁ /ĩ/ = হ্যাঁ , এঁ্যাহে = নাতো , আঁরে! /ãre = হায়! , উঁ /ũ/ = হুঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শ্বাসাঘাত : চাকমাতে শ্বাসাঘাত (stress) বিশেষ ধ্বনিমূলীয় (phonemic) উপাদান হিসেবে ব্যববহৃত হয়। কোনো স্বরধ্বনির উপর শ্বাসাঘাত যুক্ত হলে ভিন্ন অর্থের সৃষ্টি হয়। এটি আসলে চাকমা ভাষার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যও। যেমন, i /í/ í [1] ic (লাঙ্গলের ঈশা) /íc/ (সেচন করো); e/é [1] el (জমির আইল, ছিল) /él/ (সবুজ,শ্যামল); u/ú [1] ul (ব্যাঙের ছাতা, wool) /úl/ (হুল, অণ্ডকোষ) ইত্যাদি। aŋ/aŋ́ = মন্ত্রের নক্‌শা / জ্বলো।

ব্যঞ্জনধ্বনি : চাকমাতে যে সকল ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় ([illegible]) উদাহরণসহ দেওয়া হলো :

উচ্চারণ	ওষ্ঠ্য		দন্ত্যমূলীয়		তালব্য		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠনালীয়	
স্থান	অঘোষ	অঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	p	b	t	d			k	g		
মহাপ্রাণ	p^h	b^h	t^h	d^h			k^h	g^h		
ঘর্ষণজাত	ɲ	v	s	z z^h	ç	$ç^h$	x		ħ	h
নাসিক্য		m		n				ŋ		
পার্শ্বিক				l						
কম্পনজাত				r						
নৈকট্যমূলক		w						y		

সারণি-০১ : চাকমা ব্যঞ্জনধ্বনি

/pɔr/ *পর্* (পড়ো), /ɸɔr/ (আলো), /p^{h}or/ *ফোর* (পালক), /bei/ *বেই* (দিদি সম্বোধনে), /bhei/ *ভেই* (ভাই), /milab^{h}ua/ *মিলাভুয়া* (মেয়েটি), /tagɔ/ *তাগল* (দা), /t^{h}aga/ *থাগা* (বৌদ্ধমন্দিরের তত্ত্বধায়ক), /d̪ol/ *দোল* (সুন্দর), /d̪^{h}up/ *ধুপ* (সাদা), /xɔ/ (ঘুঘু), /nak/ *নাক* (নাক), /d̪ekk^{h}ye/ *দেখ্যে* (দেখেছে), /gaŋ/ *গাঙ* (নদী), /g^{h}eŋ/ *ঘেং* (বৌদ্ধভিুদের প্রবজ্যা গ্রহণের জন্য নির্মিত সীমাগৃহ), /sud̪om/ *সুদোম* (প্রথা, রীতিনীতি), /ʃlɔlɔŋ/ *শলং* (খোলস), /ɟil/ *জিল* (জিভ / জিহ্বা), /ɟ^{h}ar/ *ঝার* (জঙ্গল / বন), /macchua/ *মাচ্ছুয়া* (মাছটি), /hillɔ/ *হিল্ল* (পাহাড়ি / খিল জাতীয়), /ħera/ *হেরা* (মাংস), /mila/ *মিলা* (মহিলা), /naŋ/ *নাঙ* (নাম), /lud̪uŋ/ *লুদুং* (লবণ ইত্যাদি সংরণের লাউয়ের খোল), /ribaʔ/ *রিবাং* (বৃক্ষের কেন্দ্রস্থিত শক্ত মাজা), /waʔ/ *ওয়াং* (এক প্রকারের চিল), /yariʔ/ *ইয়ারিং* (কানের দুল বিশেষ) ইত্যাদি। উল্লেখ্য, চাকমাতে ট-বর্গের ধ্বনিগুলি /ট, ঠ, ড, ঢ/ নেই ; যদিও লেখার জন্য বর্ণ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ত-বর্গের ধ্বনিগুলি তাদের স্থলে ব্যবহৃত হয়।

শব্দভাণ্ডার

চাকমা ভাষায় এ যাবৎ বেশ কয়েকটি অভিধান ও শব্দকোষ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি থেকে এবং ভারতের কলিকাতা, আইজল, কোহিমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল অভিধানে কোথাও বাংলা বর্ণ, কোথাও চাকমা বর্ণ কিংবা কোথাও ইংরেজি বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় সবকটি অভিধানই দ্বিভাষিক। অভিধানগুলিতে প্রচুর চাকমা শব্দ স্থান পেয়েছে। এতে দেখা যায়, অতীতে চাকমা ভাষার বহু শব্দ পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যেমন – পালি > চাকমা : উজু > উজু (সোজা); কুন্ডি > চাং; *কুত্তি* (বিশেষ ধরনের জল রাখার মৃৎপাত্র); সুত্তং > সুদোম (প্রথা, রীতিনীতি); অম্হে > আহ্মি /amhi/ (আমরা); তুম্হে > *তুহ্মি* /ṭimhi/ (তোমরা); সংস্কৃত > পালি: সরিৎ > *সোরি* (ছোটনদী / স্রোতস্বিনী); কুত্র > *কুধু* (কোথায়); ঝাটিতি > *ঝাদি*; পিশুণ > পিঝুম (ঈর্ষা); শবশালা > *চবাশাল* (শ্মশান, সমাধি); মৈনাক > *মোন* (পর্বত)। তিব্বতি-বর্মি () ভাষাগুলির বহু শব্দের চাকমা ভাষায় আগম ঘটেছে। যেমন – *জুম*, *তারেং* (পাহাড়ের সুউচ্চ খাড়া পার্শ্বদেশ), *কিজিং* (পাহাড়ের মধ্যস্থিত ছেদ হওয়া নিম্নস্থান), *রান্যা* (জুমের শেষাবস্থা বা শেষ পর্যায়ের জুমখেত), খুয়াং (উপত্যকা), সাগা (আড়াআড়ি ভাবে বাঁশের নির্মিত জুমে অধিকার প্রতিষ্ঠার চিহ্ন বিশেষ) ইত্যাদি। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও ফারসি থেকেও বহু শব্দ চাকমা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে স্কুল, কলেজ, অফিস ও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সূত্রের অসংখ্য শব্দ বাংলা থেকে চাকমা ভাষায় সরাসরি অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে প্রবেশ করেছে এবং করছে। চাকমার নিজস্ব শব্দ সংখ্যা কী পরিমাণ হতে পারে তা নির্ণয়ের জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। পাখিদের নামে চাকমাদের মৌলিক শব্দ দেখা যায়। যেমন – রংরাং (ধনেশ), বোরুনি (এক জাতীয় ছোট পাখি), হ্যধেংপুত্তি (ংশুষধৎশ জাতীয় ছোট পাখি), কুইয়াপেইক (হলদেপাখি), বিজুপেইক (শ্যামা), মেমেছাগলি (ছোট পাখি বিশেষ), পেরা (বাবুই), হেতদাগা (হরিয়াল), ওয়াং (এক জাতীয় চিল), খুরোল্যা (কাঠঠোকরা পাখি) ইত্যাদি। বহু গাছগাছালি বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও চাকমা নাম চোখে পড়ে। যেমন – সাবারাং, ফুঝি, পভাংলুদি, ওঝোনশাক, মেইয়াশাক, চামোনি-কাথোল, গুত্গুত্যা, বান্দরনাক্শা, কেদাফল, মগাপিত্তিংগুলা, ঘেরে-আম, হ্মাল্যাং, কগুলা, পিধাগুলা ইত্যাদি। চাকমা মেয়েরা নিজস্ব কোমরতাঁতে কাপড় বুনে। তাদের নকশাকৃত কাপড় 'আলাম'-এর 'ফুল' (নক্শা)-গুলি তাদের নিজস্ব। তারাই এগুলির নামকরণ করে। যেমন – করঙাকাপ্যা, তিন বেইয়া, তুত্তুবি-হআদ-ব , জুনিচোক, সাব'কাঙেল, পাদিচাবাং ইত্যাদি। চাকমাদের নিজস্ব অসংখ্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে। যেমন – তাগৎতাগৎ, ভাগৎভাগৎ, চিরিৎচিরিৎ (প্রস্রাবের ভঙ্গিবিশেষ), থেবৎথেবৎ (ঘনঘন), ঘুঙ্গুরুংঘাঙ্গারাং (খালি ড্রাম নাড়াচাড়ার শব্দ), ভুদুচভাদাচ, ফুংফাং (ফায়ারিঙের শব্দ), থুচথাচ (চড়থাপ্পড় মারার শব্দ), ভুকভাক (উত্তমমধ্যমের / কিল মারার শব্দ), ভরাৎভুরুৎ, ফুদুচফাদাচ (দড়ি ছেঁড়ার শব্দ) ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দগুলি যখন আ-কার যোগে আকারান্ত বিশিষ্ট ক্রিয়াতে পরিণত হয়। যেমন – তনতনানা, তকতগানা, ভুতভুদানা, চেকচেগানা, ঝুবঝুবানা, চিকচিগানা ইত্যাদি। ক্রিয়াবিশেষণের ত্রেও একই কথা বলা যায়।

শব্দগঠন

চাকমাতে মূলশব্দ বা শব্দের মূলাংশ অথবা ধাতুর পরে সাধারণত নানা প্রকার প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করে। তবে উপসর্গ যুক্ত হলে তা আগে বসে। নঞ্যার্থে অ, আ, বে উপসর্গগুলি শব্দের পূর্বে বসে। যেমন – *অ-জাত* (বেজাত, বেজন্মা), *অ-মগধ* (মগধসুলভ নয় : অশিষ্টাচারী অর্থে), *আ-কার্জ্যা* (আকাড়াকৃত), *আ-সুল্যা* (খোসা ছাড়ানো হয়নি এমন), *বে-দিঝা* (বেদিশা, দিশাহীন), *বে-কুচ্যা* (অসুবিধাজনক) ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ বিশিষ্ট শব্দের পরে উয়া, ইয়া, ইয়াল ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন – *ঝার* (বন) + *উয়া*= ঝার্বুয়া (বন্য); জাল+ *ইয়া* = জাল্যা; খেত + *ইয়াল* = খেত্যাল (খেতের কাজকর্মে পারদর্শী এমন কৃষিজীবী। চাকমাতে পদাশ্রিত নির্দেশকরূপে বিশেষ্য পদের শেষে স্বরান্ত্য শব্দের ক্ষেত্রে '-ভুয়া' এবং ব্যঞ্জনধ্বনি-অন্ত্য শব্দের পরে '-উয়া' যুক্ত হয়। যেমন, মিলা + ভুয়া = মহিলাটি; গাচ + উয়া = গাচ্ছুয়া (গাছটি)। বচনান্তর করার ক্ষেত্রে একবচন বিশিষ্ট শব্দের পরে প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে স্বরান্ত্য হলে 'গুন' এবং ব্যঞ্জনান্ত্য শব্দের ক্ষেত্রে 'উন' আর জমি, স্থান, চ্যাপ্টা জিনিসের ক্ষেত্রে '*আনি*' যুক্ত হয়ে বহুবচন বিশিষ্ট শব্দ গঠন করে। যেমন – মিলা+ গুন = মিলাগুন (মহিলারা/ মেয়েরা); ফুল+উন = *ফুলুন* (ফুলগুলি); ঘর + আনি = ঘরানি (ঘরগুলি)।

চাকমাতে ক্রিয়ামূল বা ধাতুর শেষে কৃৎপ্রত্যয় 'না' যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যেমন – ল+না= লনা (নেওয়া,লওয়া), যা+না = যানা (যাওয়া), পা+না= পানা (পাওয়া)। নিম্নে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার অবস্থানে ল ধাতু দিয়ে গঠিত বিভিন্ন শব্দ যোগে গঠিত একটি বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হলো :

যেমন, ল+ইয়া= লোইয়া (যে লয়/গ্রহণকারী), লোইয়া + ভুয়া = লোইয়াভুয়া (গ্রহণকারীটি), ল+না= লনা (নেওয়া, লওয়া), লনা+ আন = লনাআন (যা গৃহীত বা গ্রহণ করা হয়েছে), ল + ল = লল।

কর্তা কর্ম ক্রিয়া

লোইয়াভুয়া লনাআন লল

পুং ও স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ই, বি, পুদি, নি ইত্যাদি স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – ভুল + আ = ভুলা (বোকা); ভুল + ই = ভুলি (বোকা মেয়ে); জাল + ইয়া = জাল্যা (জেলে); জাল+ ইয়ানি= জাল্যানি (জেলেনি); সাহ্‌ব (সাহেব) + নি = সাবোনি; সনা (সোনা)+বি = সনাবি (স্বর্ণময়ী); ধন+ পুদি (< পতী/পালিতে পুত্রবতী অর্থে ব্যবহৃত পুত্তপতী) = ধনপুদি (ধনবতী)।

কারক বিভক্তি

কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারকে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদবিশিষ্ট শব্দের পরে যথাক্রমে শূন্য, রে, লোই /দি, রে, থুন, র, ত। লক্ষণীয়, যে চাকমাতে কর্মকারকে ও সম্প্রদান কারকে 'রে' বিভক্তি যুক্ত হয়।

বাক্যগঠন

বাক্যের গঠন কর্তৃবাচ্যের ক্ষেত্রে হলো কর্তা (Subject)-কর্ম (Object)-ক্রিয়া (Verb) আশ্রয়ী। যেমন – একটি হাঁ-বোধক বাক্য, তে *ভাত খায়* = সে ভাত খায়। এই বাক্যটিকে না-বোধক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মূল ক্রিয়ার পূর্বে নঞার্থে বর্তমান কালে 'ন' বসে। বাক্যটি যদি অতীতকালের হয়, যেমন – তে ভাত খেইয়ে = সে ভাত খেয়েছে, সেক্ষেত্রে মূল ক্রিয়ার পূর্বে শ্বাসাঘাতযুক্ত 'নহ্‌' (nɔ́) বসে। যেমন – তে ভাত নহ্‌ খায় = সে ভাত খাইনি। প্রশ্নবোধক বাক্যে কি,ক্যা, কুধু, কন্নাহ্‌, কমলে ইতাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ-বোধক বা না-বোধক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরের সময় বাক্যের শেষে 'নি', 'নে' কিংবা 'নেনা' ব্যববহৃত হয়। যেমন – তে ভাত খেবনি ? = সে ভাত খাবে কি?

চাকমাতে বিস্ময়বোধক বাক্য রয়েছে। যেমন – বাহ্‌! কী দোল পেইক! = বাহ্‌! কী সুন্দর পাখি! অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে চাকমাতে ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কেবল ধাতু বা ক্রিয়ামূল ব্যবহৃত হয়। যেমন – তুই ল = তুমি লও ; তুই যা = তুমি যাও/ তুই যা; তুই গর্‌ = তুমি করো ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে চাকমা প্রবাদ-প্রবচন সমৃদ্ধ ভাষা। এগুলিকে *দাঘকধা* বলে। চাকমারা বলে, 'দাঘকধা ফেলা ন যায়' অর্থাৎ, ডাকের বচন ফেলা যায় না।

সম্মানার্থে সর্বনাম ও ক্রিয়ার ব্যবহার

চাকমাতে সম্মানার্থে ও সম্ভ্রমার্থে ব্যক্তি একজনই হোক কিংবা বহুজনই হোক সব সময় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে বহুবচন বিশিষ্ট শব্দ ও বহুবচনে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ামূলের সাথে বহুবচনে ব্যবহৃত ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন –

তুহ্মি কন্নাহ? = আপনি/আপনারা/ (তোমরা) কে?

তারাহ্‌ কেঝান আঘন ? = তিনি/উনি/তাঁরা/ওনারা/ (তারা/তাহারা) কেমন আছেন?

চাকমাতে গর্বা-কুদুম বলে বিশেষ ধরনের আত্মীয়তা আছে। এ জাতীয় আত্মীয় বা কুটুম্বের সাথে তার বয়স যাই হোক না কেন, সামাজিক রীতি অনুযায়ী তার সাথে বহুবচনে কথা বলতে হয়।

ক্রিয়ার কাল ও বিভক্তি

গর্‌ ধাতু যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ।

কিন্তু ২০০১ সন থেকে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত *চাঙ্‌মা পত্থম পাত* বইটিতে ৩২টি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ৭টি স্বরবর্ণ আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত চাকমা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি নীচে উদ্ধৃত হলো (বন্ধনিতে a বর্ণটি আ ধ্বনি হিসেবে যুক্তাবস্থায় রয়েছে): 𑄇(ka), 𑄈(kha), 𑄉(ga), 𑄊(gha), 𑄋(ʔa), 𑄌(ca/ sa), 𑄍(cha/), 𑄎(za), 𑄏(zha), 𑄐(ḷa), 𑄑(ʔa), 𑄒(ʔha), 𑄓(ʔa), 𑄔(ʔha), 𑄕(na), 𑄖(ta), 𑄗(tha), `(da), 𑄙(dha), 𑄚(na), 𑄛(pa/ɲa), 𑄜(pha), 𑄝(ba), 𑄞(bha/vã, 𑄟(ma), 𑄠(za), 𑄢(ra) , 𑄣(la), 𑄤(wa), 𑄥(ša),এবং স্বরবর্ণগুলি হলো : 𑄃𑄧 (ʔ) 𑄃(a), 𑄃𑄨(i) , 𑄃𑄪 (u), 𑄃𑄮 (o), 𑄃,'(oi)।

অঝাপাঠে-এ কেবল একটি মাত্র স্বরবর্ণ ছিল এবং সেটি ছিল 𑄃 (পিছপুঝা-আ)। এটি আ-স্বরধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর সাথে বিভিন্ন কারা যুক্ত করে অন্যান্য স্বরধ্বনি বা স্বরবর্ণগুলি সৃষ্টি করা হতো। উল্লেখ্য, চাকমা *অঝাপাঠ*-এর সকল বর্ণ হলো আ-কারান্ত।

চাকমা ভাষার উন্নয়ন পরিকল্পনা

চাকমা ভাষা উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি – এই দুই জেলায় চাকমারা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট। এ দুটি জেলায় চাকমা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে চাকমা ভাষার উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কাজের দ্রুত অগ্রগতি লাভের জন্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি শহরের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চাকমাদের নিয়ে কাজ করতে হবে।

২. বর্তমানে এনজিও-গুলির সহযোগিতায় প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুদের চাকমা বর্ণে ও ভাষায় পড়ালেখার কাজ করা হচ্ছে। এ প্রচেষ্টা বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

৩. স্কুলপাঠ্য বইগুলি চাকমা ভাষায় লিখতে হলে যথাযথ চাকমা বর্ণ ব্যবহার করা আবশ্যক। এ বিষয়ে রাঙ্গামাটিস্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট যে ধরনের বর্ণ ব্যবহার করছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। চাকমা শব্দের বানানরীতির ক্ষেত্রে তাদের বানানরীতি আপাত বিবেচ্য হতে পারে।

৪. চাকমা শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ ও চাকমা সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৫. গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাকমা ভাষায় পাঠদানের প্রক্রিয়াধীন বিষয়টি বাস্তবায়িত করতে হবে এবং চাকমা সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য চাকমা বানান অভিধান তৈরি করতে হবে।

৭. বাংলা একাডেমির আঙ্গিকে স্বল্প পরিসরে হলেও চাকমা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

Grierson, G.A. 1903. *Linguistic Survey of India* . Vol.-V , Part-I. Calcutta

Maniruzzaman, et al. 1984. *Notes on Chakma Phonology: Tribal Cultures in Bangladesh*. Rajshahi University

M. Paul Lewis (ed.). Ethnologue. 2009. *Languages of the World*. 16th edition. Dallas: USA

মনিরুজ্জামান। ১৯৯৪। *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*। বাংলা একাডেমী : ঢাকা :

মনসুর মুসা। ১৯৯৪। *ভাষাপরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। মুক্তধারা : ঢাকা

অশোক কুমার দেওয়ান। ১৯৯৩। *চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার*। সুদীপ্ত প্রিন্টার্স প্রে এন্ড প্যাকেজেস: ঢাকা

সুগত চাকমা। ১৯৮৮। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট : রাঙ্গামাটি

--। ২০০০। *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

--। ২০০২। *বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য*। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

চাক ভাষার বর্তমান অবস্থা

অংখ্যাই চাক

সূচনা

চাক বাংলাদেশের পার্বত্যচট্টগ্রামের এক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম। বাংলাদেশে তারা এ নামেই পরিচিত। চাকরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে আচাক পরিচয় দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে বান্দরবান পার্বত্যজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা তাদের আবাসভূমি। বাংলাদেশের চাক নৃ-গোষ্ঠী ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত তা সুস্পষ্ট নয়।

পার্বত্য জেলায় চাকদের অবস্থান দশম বা নবম হতে পারে। তাদের শিক্ষা কিংবা সাক্ষরতা জ্ঞানের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও, অন্তত এটুকু বলা যায় যে, বর্তমানে প্রতিটি চাক পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়গামী এবং বেশিরভাগ পরিবারে ন্যূনতম একজন হলেও মাধ্যমিক বা এসএসসি পাস রয়েছে। চাকরা অতীতকাল থেকে পাহাড়ে বসবাস করে আসছে। তারা খুবই অবহেলিত ও পশ্চাদপদ এবং দুর্গম এলাকায় বাস করে। সময়ের তাগিদে চাকরা বর্তমানে শিক্ষার দিকে ঝুঁকলেও অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র উচ্চশিক্ষা নিতে পারছে না। তাছাড়া সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বেশ লক্ষণীয়। তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। চাকদের প্রাচীন ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাতে ধারণা করা হয় যে, তারা শাক্য বংশভুক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ১৬শ অব্দপূর্ব তথা গৌতম বুদ্ধের জন্মের ৯৩৪ বছর পূর্ব থেকে চাকরা ভারতের মধ্য প্রদেশ থেকে য়ুনান, মণিপুর উপত্যকা ইত্যাদি স্থান হয়ে মায়ানমার উত্তরাঞ্চল তথা তাগোহ্ এবং আরাকান অঞ্চলে পদার্পণ করে। চাকরা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য না হারালেও, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় আধুনিকতার ছোঁয়ায় হোক বা বিভিন্ন জাতিসত্তার সাথে পাশাপাশি অবস্থানের কারণেই হোক এসবের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের পরিবর্তন বেশ লক্ষণীয়। অতীতে তারা 'নাগ্রিঃ লু ম্যঃ' অর্থাৎ, কানবড় জাতি নামে পরিচিত ছিল। কারণ চাক মেয়েরা অল্প বয়স থেকে ধীরে ধীরে কানের ছিদ্র বড় করে 'নাতং ফ্রো' অর্থাৎ কানে রুপোর আংটি বা রিং পর্‌ত। অতিবৃদ্ধা ব্যতীত বর্তমান রমণীদের মধ্যে এ প্রথা আর দেখা যায় না। চাকদের ধর্ম বৌদ্ধ। বয়ঃবৃদ্ধদের লোকশ্রুতিতে শোনা যায়, অতীতে চাকদের লিখিত ভাষা ছিল। কিন্তু কালচক্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে ও অন্য এক বৃহত্তর জাতির সাথে যুদ্ধের ফলে ঐ লিখিত ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। গত ২০১১ সালে চাক জাতির প্রথম স্নাতক মংমং চাক সুদীর্ঘ ২০ বছর বিভিন্ন ভাষা গবেষণা করে চাক ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত চাক ভাষার এ বর্ণমালা বর্তমানে বাংলাদেশে ও মায়ানমারে বসবাসরত চাক সমাজে সমাদৃত হচ্ছে।

চাক ভাষা

বিভিন্ন ভাষা গবেষকদের মতে চাক তিব্বতি-বর্মি পরিবারের ভাষা। চাকদের নব উদ্ভাবিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এগারোটি এবং ব্যঞ্জণবর্ণ চৌত্রিশটিসহ মোট পঁয়তাল্লিশটি বর্ণ রয়েছে। এছাড়া আছে দশটি স্বরধ্বনি চিহ্ন এবং চারটি ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্ন। বর্ণবিহীন চিহ্ন আছে আরও সাতটি। চাক বর্ণ মাত্রাহীন এবং আ-কারান্ত হলেও বর্ণবিহীন কিছু চিহ্ন যোগ করে অ-কারান্ত করা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাক ভাষায় অ-কারান্ত যুক্ত কথা বা ভাষা ব্যবহার খুবই কম। চাকদের নব-উদ্ভাবিত বর্ণমালায় বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তা ইউনিকোড সমর্থিত না হওয়ায় বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে ব্যবহারের সুযোগ নেই। বাংলাদেশ চাক ভাষা উন্নয়ন কমিটি-র সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দৈন্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে চাক বর্ণমালায় তৈরিকৃত কম্পিউটার সফ্‌টওয়ারটির আরও মানোন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকে মনে করেন, চাকভাষা ও মারমা বা বর্মি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্ত তা ভুল ধারণা। চাক এবং মারমা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, চাকরা শৈশব থেকেই কম-বেশি মারমা ভাষা জানে। তাদেরকে আলাদাভাবে মারমা ভাষা শিখতে হয় না। অনেক ফলমূলের নাম চাক ভাষায় এবং মার্মা বা বার্মিজের মধ্যে মিল বেশ লক্ষণীয়। চাক ভাষায় এমন কতগুলি ধ্বনি রয়েছে যা অন্য কোনো ভাষায় লিখে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। নীচে চাক ভাষার বর্ণমালা, ধ্বনি ও শব্দগঠন প্রণালীর সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো।

চাক স্বরবর্ণ

চাকভাষার ধ্বনিসমূহ মূলত আ-কারান্তর। লক্ষণীয় যে, চাক ভাষায় অ-কারান্তর ধ্বনিযুক্ত শব্দ নেই বললেই চলে। চাক ভাষার ধ্বনি আ-কারান্তর হওয়ায় বর্ণের উচ্চারণও আ-কারান্তর হয়। এখানে চাক ভাষার ধ্বনি, প্রকৃতি, বানান প্রয়োগ চাক বর্ণে দেখানো বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হতো। সে-সুযোগ নেই বলেই নীচে চাক ভাষার বর্ণ বাংলা বর্ণে ও উচ্চারণে দেখানো হলো। সারা আখারা বা স্বরবর্ণ এগারোটি। এগুলির মধ্যে দীর্ঘস্বর চারটি : আঃ , ঈঃ , উঃ , ঔঃ , অঁঃ এবং হ্রস্বস্বর ছয়টি : আ, ই, উ, ও, এ, উঁহ্। সারা আখারা-র প্রথম বর্ণ 'আ' এর কোন চিহ্ন নেই। কারণ চাক ভাষায় 'আ' বর্ণটি একটি উপসর্গ হিসেবে ব্যবহার করে শব্দ গঠিত হয়। আপেঙ্ (ফুল), আলা (পুংজাত), আশাঃ (লাল রং) ইত্যাদি। অবশিষ্ট দশটি বর্ণের চিহ্ন বা কার রয়েছে।

চাক বর্ণ→	ဘ	ဘာ	ⴔ̊	ⴔ̊	ছ	ʔ̣	ơ	ˎ	G	ö	ꭕ
বাংলা বর্ণ→	আ	আঃ	ই	ঈঃ	উ	উঃ	ও	ঔঃ	এ	অঁহ্	উঁহ্

সারণি-০১: চাক স্বরবর্ণ (সারা আখেরা)

স্বর চিহ্ন

স্বর চিহ্ন দশটি। স্বরচিহ্নকে 'পংঃ-পোক্' বলা হয় অর্থাৎ, কার-চিহ্ন। চাক ভাষার স্বরচিহ্নগুলির ব্যবহার এবং গবেষক ও চাকভাষা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চাক বর্ণসহ বাংলা উচ্চারণে দেখানো হলো।

চাক বর্ণ\\→	ဘာ = ɔ	ⴔ̊ = ˚	ⴔ̊ = ˙	
বাংলা বর্ণ→	আঃ = আঃপোং	ই = আফুং আ ই ট্ঠাং	ঈঃ = আফুং আ ঈঃ ট্ঠাং	
চাক বর্ণ→	ʔ = L	ʔ̣ = IL	ơ = ϲɔ	ớ = ϲʖ
বাংলা বর্ণ→	উ = কারা কিং	উঃ = নিংকা কিং	ঔ = ও পোং	ঔঃ = ঔপোং
চাক বর্ণ→	G = ϲ	ö = ˚˚	ꭕ = ‿	
বাংলাবর্ণ→	এ = এচ্চুহ্	অঁ = অঁ ট্ঠাং (চাক ভাষায় পানি যেভাবে বলা হয়)	উঁহ্ = উঁহ্ তাক্ (চাক ভাষায় হাতি বলতে যেভাবে বলা হয়)	

সারণি-০২ : চাক বর্ণমালার স্বরচিহ্ন

উল্লেখ্য যে, স্বরবর্ণের শেষ দুটি বর্ণের উচ্চারণ খুব ব্যতিক্রমী। বাংলায় যেভাবে লেখা হয়েছে উচ্চারণ ঠিক সে রকম হবে না। চাকভাষীরাই তা পারবেন।

ব্যেঃ আখরা (ব্যঞ্জণ বর্ণ)

চাকভাষায় ব্যঞ্জণ বর্ণকে ব্যেঃআখরা বলে। ব্যেঃ আখরা মোট ৩৪টি। ব্যেঃ আখরা সাতটি বর্গে বিভক্ত। প্রথম ছয়টি বর্গে পাঁচটি করে বর্ণ এবং শেষ বর্গ বা 'শা' বর্গে চারটি বর্ণ রয়েছে। যেমন - কা বাগা (ক বর্গ), চা বাগা (চ বর্গ), টা বাগা (ট বর্গ), তা বাগা (ত বর্গ), পা বাগা (প বর্গ), য়া বাগা (য় বর্গ), শা বাগা (শ বর্গ)। ব্যেঃ আখারায়ও শেষ দুটি বর্ণের উচ্চারণ অন্য ভাষায় নির্দেশ দুরূহ। তৎসত্ত্বেও উচ্চারণ বাংলায় লিখে চাক ভাষা ব্যেঃ আখারা (ব্যঞ্জণবর্ণ) পাশে দেওয়া হলো।

চাক বর্ণ (কা বাগা)	ന	ര	ၵ	ၒ	ϲ̈
বাংলা বর্ণ (ক বর্গ)	কা	খা	গা	ঘা	ঙা
চাক বর্ণ (চা বাগা)	˛	ꝏ	˙	ഝ	ঞ
বাংলা বর্ণ (চ বর্গ)	চা	ছা	জা	ঝা	ঞা
চাক বর্ণ (টা বাগা)	Ɛ	S	ვ	ൽ	ই
বাংলা বর্ণ (ট বর্গ)	টা	ঠা	ডা	ঢা	ণা
চাক বর্ণ (তা বাগা)	ഩ	ᘕ	૩	ഠ	૪
বাংলা বর্ণ (ত বর্গ)	তা	থা	দা	ধা	না
চাক বর্ণ (পা বাগা)	ꝺ	ջ	ဗ	ꝏ	ω
বাংলা বর্ণ (প বর্গ)	পা	ফা	বা	ভা	মা
চাক বর্ণ (য়া বাগা)	ω	ᢐ	ᔕ	ο	ꭤ
বাংলা বর্ণ (য় বর্গ)	য়া	রা	লা	ওয়া	সা
চাক বর্ণ (শা বাগা)	ஜ	ദ	♀	ꭗ	
বাংলা বর্ণ (শ বর্গ)	শা	হা	ট্ঠা	বৃপ্লাহ্	

সারণি-০৩ চাক মাতৃভাষার ব্যঞ্জণবর্ণ (ব্যেঃ আখারা)

বাক্যগঠন

চাক ভাষার বাক্যগঠনে কর্তা বাক্যের প্রথমে এরপর কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া বসে। নিম্নে কিছু বাক্যগঠন দেওয়া হলো।

চাক	[illegible]	[illegible]
বাংলা (অর্থসহ)	ঙা পুক্ সাগাঃ। আমি ভাত খাব।	মেংসারাক্ বঃলুং ক্রুতুঙহে। ছেলেরা বল খেলছে।
চাক	[illegible]	[illegible]
বাংলা (অর্থসহ)	নিংগা প্রেংঃ কানাংঃহে। আমাদের দেশ সুন্দর।	আনঁঃ ঙাং ক্রুক্হে। মা আমাকে ভালবাসেন।
চাক	[illegible]	[illegible]
বাংলা (অর্থসহ)	নিংগা ক্যং কানাংঃহে। আমাদের বিদ্যালয় সুন্দর।	নিংয়াক্ মাক্তা চাঃপ্রেংঃহে। আমরা সবাই এক সাথে পড়ি।

বর্তমান চাক ভাষার সাথে বর্মি বা মারমা ও মগ ভাষার সাথে সাদৃশ্য দেখা যায়। অতীতকাল থেকে বিভিন্ন জাতিসত্তার পাশাপাশি অবস্থানের কারণে সম্ভবত ভিন্নজাতির ভাষা চাক ভাষায় আত্তীকরণ হয়েছে। প্রাপ্ত প্রাচীন চাক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত চাকরা পিইউ, ম্রো, বর্মি ইত্যাদি জাতির পাশাপাশি বসবাস করেছিল। বর্তমানে চাকদের পাড়াগাঁয়ের পাশাপাশি মারমাদের পাড়াগাঁ দেখা যায় এবং ধর্মগুরু হিসেবে প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে বর্মি বা মারমা ভিক্ষুদেরকে দেখা যায়। যে কারণেই হোক চাকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও কোনো চাক ছেলে বা পুরুষকে চিরজীবনের জন্যে ভিক্ষুজীবন বা কোনো চাক মহিলাকে 'ভিক্ষুণী' জীবন গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

চাক ভাষার কিছু শব্দ নিম্নে পাঠকদের জন্য বাংলা অর্থসহ তুলে ধরা হলো।

চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	বড় ভাই	পুং জাত	স্ত্রী জাত	পুরাতন	চূড়া	পতাকা
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	এখন	মামা/শশুর	মামী/শাশুড়ি	বৌদি	ভাত	মৃত্যু
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	মাথা/মস্তক	পেট	চোখ	হাড়	চামড়া	মাংস

সংখ্যা গণনা :

চাকদের সংখ্যা গণনার জন্যে নিজস্ব সংখ্যা রয়েছে। তাদের গণনার ক্ষেত্র বেশ বৈচিত্র্যময়। যেমন – মানুষ গণনায় একজন হলো 'হুআ'। পশু গণনায় একটি গরু, মহিষ, হাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'তারা'। ফুল গণনায় একটি ফুল হলে 'পোআ'। বৃক্ষাদি গাছপালা গণনা ক্ষেত্রে একটি হলে 'ফাংনা'। মাছ গণনায় একটি মাছ হলে 'মারা'। ওজন পরিমাপের ক্ষেত্রে এক কেজি হলে 'সেক্তা'। বাড়িঘর গণনা ক্ষেত্রে একটি বাড়ি হলে 'ছংনা'। গ্রাম গণনার ক্ষেত্রে একটি গ্রাম হলে 'থিংনা'। দেশ গণনা ক্ষেত্রে একটি দেশ হলে 'প্রেঙনা'। অনির্দিষ্ট যে-কোনো একটি জিনিস বা বস্তু গণনা ক্ষেত্রে 'সুআ' ইত্যাদি। দেখা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে শেষাংশে 'আ' যুক্ত রয়েছে। চাকদের সংখ্যা গণনায় একককে বলা হয় 'আ'। নিম্নে চাক ভাষায় ত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা চাক বর্ণ এবং তা বাংলায় উচ্চারণ দেখানো হলো (চাকদের সংখ্যা গণনায় অন্তত ত্রিশ পর্যন্ত না হলে দশক গণনা ক্ষেত্রে ভুল ধারণা হতে পারে। ফলে ত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যা এবং কিছু একক গণনা তুলে ধরা হয়েছে)।

চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	১	আ	১১	সঁহ্: আ	২১	হুং: আ
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	২	নিং:	১২	সঁহ্: নিং:	২২	হুং: নিং:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৩	সুঙ:	১৩	সঁহ্: সুঙ:	২৩	হুং: সুঙ:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৪	প্রঁ:	১৪	সঁহ্: প্রঁ:	২৪	হুং: প্রঁ:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৫	ঙা:	১৫	সঁহ্: ঙা:	২৫	হুং: ঙা:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৬	ক্রুক্	১৬	সঁহ্: ক্রুক্	২৬	হুং: ক্রুক্
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৭	সানিং	১৭	সঁহ্: সানিং	২৭	হুং: সানিং
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৮	আচেক্	১৮	সঁহ্: আচেক্	২৮	হুং: আচেক্
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৯	তাহুহ্	১৯	সঁহ্: তাহুহ্	২৯	হুং: তাহুহ্
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	১০	সঁহ্:	২০	হুং:	৩০	সুঙ: জঁহ্:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৪০	প্রেং: জঁহ্:	৫০	ঙেং: জঁহ্:	৬০	ক্রুক্ জঁহ্:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বাংলা	৭০	সানিং জঁহ্:	৮০	আচেক্ জঁহ্:	৯০	তাহু জঁহ্:
চাক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
বাংলা	১০০	রা	১০০০	খোঙ্	১০০০০০০০ (কাদুংনা)	

চাক ভাষায় একক গণনা নিম্নরূপ :

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
উচ্চারণ	পাথামা:	দুতিয়া:	তাতিয়া:	চাদুথা	প্যেংজা:	চাতামা	ছাতামা	আতামা	নোওয়ামা	দাসা
বাংলা	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম

চাকভাষা ধারণ এবং বিকাশ

চাকভাষার লিখন ব্যবস্থা সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। নব-উদ্ভাবিত চাক বর্ণমালার উচ্চারণ প্রচলিত চাক কথ্যভাষার সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু চাক কথ্যভাষায় প্রায় কাছাকাছি উচ্চারিত অনেক শব্দ থাকায় শব্দগঠনে অনেক দোদুল্যমান অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে 'বাংলাদেশ ভাষা উন্নয়ন কমিটি'র মাধ্যমে সমাধানের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। বাক্য গঠনে তেমন সমস্যা দেখা যায় না। চাক নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা নিম্ন-বর্ণিত উপায়ে সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বিকাশ করা যেতে পারে :

ক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা ও পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সামাজিক সচেতনতাবোধ সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে তা করা যায়।

খ দেশে সব মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে মাতৃভাষায় একটি নির্দিষ্ট বিষয় প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রচলন করা যেতে পারে।

গ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বিষয়ক পাঠ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র রক্ষিত হবে।

ঘ বর্তমান শিক্ষাক্রমে দেশের সকল মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয় অর্ন্তভুক্ত না থাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা নিজেদের মায়ের ভাষার বর্ণমালা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভাষা করায়ত্ত করতে গিয়ে তাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষায় পাঠ্যবই বা পাঠগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলে অন্য ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ বেশ সহজতর হবে।

ঙ প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে (যে সকল বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী আছে) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

চাক ভাষার বর্তমান অবস্থা

চাক ভাষা প্রাচীন ভাষা হলেও এর বর্ণমালা তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক। উদ্ভাবিত বর্ণমালা চাকদের বর্তমান কথ্য ভাষার সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় তা দ্রুত প্রচলিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ লিখন ব্যবস্থা আরও উন্নত ও প্রযুক্তিবান্ধব হয়ে উঠবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সরকারি সে-উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অতিদ্রুত আমরা সুফল ভোগ করতে পারব।

সাক এবং চাক

সাক এবং চাক অভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী। মায়ানমায়ের রাখাইনরা তাদেরকে সাক বলে পরিচয় দেয়। এ দেশে তারা চাক নামে পরিচিত। এর একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। পাকিস্তানি শাসনামলে বান্দরবানের মাং রাজা কর্তৃক তার প্রজাদের পরিচয় চেনার লক্ষ্যে নামের শেষে যার যার জাতিসত্তার বা গোত্রের নাম লেখার নিদের্শ দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশের বসবাসরত বর্তমান চাকরা বেশ বিপাকে পড়ে। বর্তমান প্রজন্ম থেকে বড় জোর তিন প্রজন্ম পূর্বের সরকারি বিভিন্ন রেকর্ড পত্রে (বিশেষত জমি সংক্রান্ত) চাকদের নামের শেষে কোনো কিছু লেখা থাকত না। অর্থাৎ, নামের শেষে স্ব জাতিসত্তার বা গোত্রের নাম লেখা হতো না। এ অবস্থায় চাকরা নিজেদেরকে 'আচাক' নামে পরিচয় দিতে থাকে। সেই থেকে তাদের নামের শেষে 'চাক' শব্দটি লেখার প্রচলন শুরু হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহুভাষা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা এবং ভাষা সংস্কৃতি উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার, লালন-পালন করার ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাতৃভাষা উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উজ্জ্বলতর হবে।

বৈচিত্র্যের বন্ধন ও বিশ্বায়নে মাতৃভাষা

সাইফুর রশীদ
হাসান শাফী

মানবজাতির সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদ হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা বিকশিত হয়েছে। মানুষের চিন্তা ও চেতনার ক্রমবিকাশের সাথে রয়েছে ভাষার নিবিড় সম্পর্ক। ভাষামাত্রই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে। সে-হিসেবে ভাষা হলো মানুষের এক অনন্য সাংস্কৃতিক অর্জন।

সামজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা আজ যে সময়ে এসে উপনীত হয়েছি একে বলা হয় বিশ্বায়নের যুগ। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর থেকে বিশ্বব্যাপী সমাজ ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। পনেরো শতক থেকে পৃথিবীর সব মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ আরম্ভ হয়। এরপর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে। সেই সময় থেকেই এক সংস্কৃতির মানুষের সাথে অন্য সংস্কৃতির মানুষের সহজাত আদান-প্রদানের পাশাপাশি শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তঃসাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে অভূতপূর্ব দ্রুততা। সাম্প্রতিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণে। ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তিগত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে মানুষ, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ভাবাদর্শ কিংবা পুঁজি অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। নৃবিজ্ঞানী আপ্পাদুরাই একে বলেছেন 'গ্লোবাল স্কেপ'। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় পৃথিবী আজ একটি বৈশ্বিক গ্রামে (Global Village) পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে সাংস্কৃতিক ব্যবধান একেবারেই কমে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে একদিকে সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তা (Cultural Homogeneity) তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ভিন্নতাও (Cultural Heterogeneity) তৈরি হচ্ছে। বলার অবকাশ রাখে না যে, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শক্তির চরিত্রও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বৃহত্তর সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কী ধরনের প্রভাব পড়বে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়টি এখানেই যুক্ত। এটি যেমন শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের উপর বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাকে রবার্ট রেডফিল্ড গ্রেট ট্র্যাডিশন (Great Tradition) ও লিটল ট্র্যাডিশন (Little Tradition)-এর ধারণা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বায়ন মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা নব্য-উদার অর্থনীতির চেতনাকে ধারণ করে। বিশ্বায়নকে সম্পদ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি পর্যায় হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এর ফলে শুধু যে বড় বড় রাষ্ট্র বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে তা-ই নয়, দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিও বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের পণ্য, শ্রম, শক্তি, প্রযুক্তি কিংবা সংস্কৃতির বাজারকে প্রসারিত করতে পারবে। ফলে সুযোগ রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের পৃথিবীর বড় বড় জাতিসমূহের সাথে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির আদান প্রদানের। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'How to Judge Globalism'-এ এবিষয়টির অবতারণা করেছেন। কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও যথাযথ সাংগঠনিক ভূমিকার উপর নির্ভর করছে বিশ্বায়নের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে কোন রাষ্ট্র কতটা সফলতা লাভ করতে পারবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে ভাষার বিশ্বায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ, প্রযুক্তি, ভাবাদর্শ, পুঁজি কিংবা সাংস্কৃতিক উপাদানের বিশ্বায়নের পাশাপাশি ভাষার ও বিশ্বায়ন ঘটছে। রাষ্ট্রের ভাষা রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক উন্নত ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আজ তাদের দেশে নানা জাতির অবস্থানের কারণে তাদের ভাষাকে সম্প্রদায়ের ভাষা (Community Language) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এ সকল ভাষার বিকাশ ও চর্চায় নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করছে। যেমনটি ঘটছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ অনেক দেশে। বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে শুধু ইংরেজিই নয়, স্প্যানিশ, জার্মান, ফরাসি, জাপানি, কোরীয় কিংবা চীনা ভাষারও

বিশ্বায়ন ঘটছে। আন্তর্জাতিক এ সকল ভাষার প্রভাবে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে অন্যান্য অন্তর্জাতিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভাষার বিকাশ অন্যান্য ভাষার প্রভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, এটিই হচ্ছে স্থানীয় ভাষার উপর আন্তর্জাতিক ভাষার আগ্রাসন। এতে প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহের ভাষারও প্রান্তিকীকরণ হচ্ছে। ভাষার এ ধরনের প্রান্তিকীকরণ যেমন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটছে তেমনি ঘটছে রাষ্ট্রের ভেতরে নানা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষার ক্ষেত্রেও। শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ভাষার আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে এবং মাতৃভাষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষাকে আজ হারাতে বসেছে। এর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আধিপত্যহীন ও অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত ভাষার উপর বৃহত্তর জনোগোষ্ঠীর ভাষার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের চিত্রই ফুটে ওঠে।

বিশ্বায়নের ফলে একদিকে যেমন ভাষা ছড়িয়ে পড়ছে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে, শক্তিশালী রাষ্ট্র থেকে দুর্বল রাষ্ট্রসমূহে, তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান পৃষ্টপোষকতা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির ফলে অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভাষারও আন্তর্জাতিক ব্যপ্তি ঘটছে। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি অর্জন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ রক্ষার কাজও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বলা প্রয়োজন যে, ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দেশের নানা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক ভাষাই সুচারুভাবে বিকশিত হতে পারেনি।

মাতৃভাষা সবার জন্য অমূল্য সম্পদ। ভাষার উপর আক্রমণকে আমরা যেমন রক্ত দিয়ে প্রতিহত করেছি, তেমনি অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষও তাদের ভাষার উপর আক্রমণকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের ভাষা রক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের মতো ভাষার সাম্রাজ্যবাদ তৈরি হয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে তাদের নিজেদের ভাষাকে চাপিয়ে দিচ্ছে দুর্বল রাষ্ট্রের ভাষার উপর সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, জাপানি কিংবা কোরীয় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তরুণদের আগ্রহ দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ কীভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের মানুষকে তাদের ভাষা শিখতে বাধ্য করছে, কিংবা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে জায়গা করে নেয়ার জন্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের তরুণরা মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে, বিশ্বায়ন শুধু এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার যোগাযোগই সৃষ্টি করছে না, এক ভাষার উপর আরেক ভাষার আধিপত্য সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের মাধ্যমে ভাষার প্রসারের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে শক্তিধর রাষ্ট্রের ভাষার আধিপত্যের কারণে স্বল্প ভাষিক সংখ্যার ভাষাগুলি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন যথার্থই বলেছেন, একটি দেশে কোনটি ঘটবে, তা নির্ভর করছে রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর।

আশঙ্কা করা হচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে আগামী ২১০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের ৬ হাজার ভাষার মধ্যে অর্ধেক ভাষাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই বিলুপ্ত হওয়া ভাষার মধ্যে অধিকাংশ ভাষাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলির। একটি মানব গোষ্ঠীর ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ঐ গোষ্ঠীর সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই বিলুপ্ত হয়। বিশ্বায়নের এই প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্র ভাষা রক্ষায় সচেতন হলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য মানুষের ভাষা দ্বারা আমাদের মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের সকল নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির লালন, বিকাশ এবং চর্চা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বৈচিত্র্যময় বন্ধন, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ফটো-গ্যালারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন

মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
International Mother Language Day 2013
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2013
শেখ হাসিনা

মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
International Mother Language Day 2013
প্রধান অতিথি :
শেখ হাসিনা
সভাপতি :
এমপি

মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
International Mother Language Day 2013
শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এমপি

Mother Language Day 2013
প্রধান অতিথি :
হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি
এমপি

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2013
প্রধান অতিথি : শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি : জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

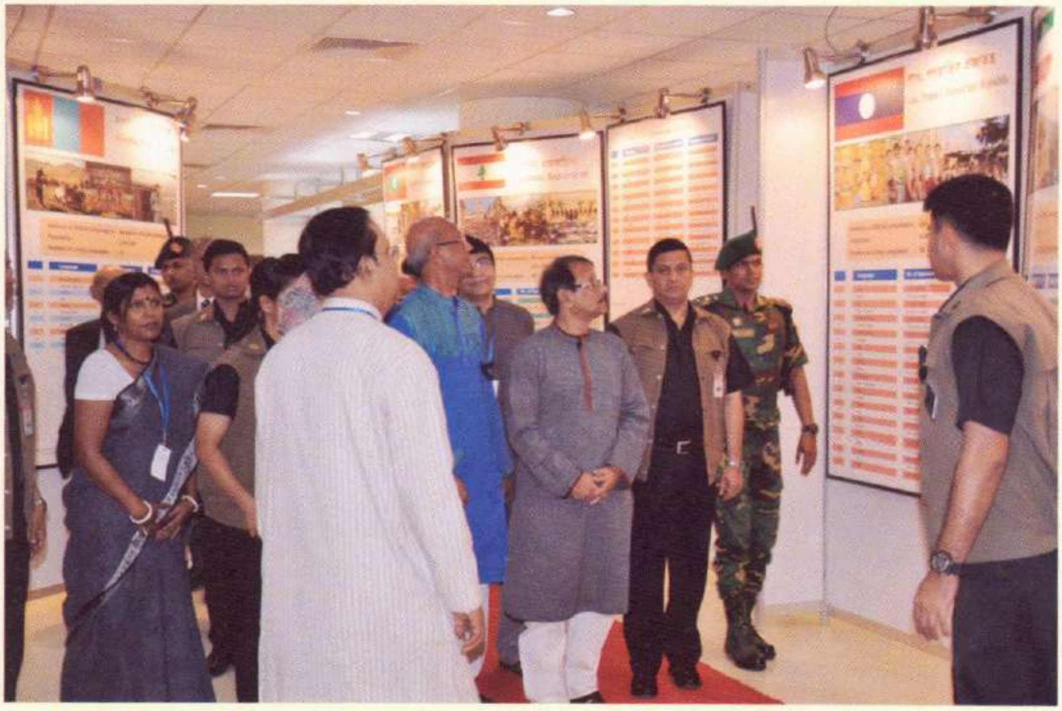

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩
সেমিনার ও আলোচনা সভা